POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023--2025

আল্লাহ্‌র বাণী

هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى
وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ۙ
وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ

তিনিই নিজ রসুলকে হেদায়াত এবং সত্য ধর্মসহ পাঠাইয়াছেন যেন তিনি সকল ধর্মের উপর ইহাকে জয়যুক্ত করেন, মোশরেকরা যতই অপছন্দ করুক না কেন।

(তওবা: ৩৩)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 9

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 14

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 4 April, 2024 25 রমযান 1445 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী

সেহরী খেয়ে রোযা রাখার মধ্যে কল্যাণ নিহিত

হযরত আবু হুরাইরাহ (রা.) বর্ণনা করেন, আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: রোযার দিনগুলিতে সেহরী খাও, কেননা সেহরী খেয়ে রোযা রাখার মধ্যে কল্যাণ নিহিত।

রমযানে রাত্রিতে উঠে নামায পড়া

হযরত আবু হুরাইরাহ (রা.) বর্ণনা করেন, আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: যে ব্যক্তি ঈমানের দাবি পূর্ণ করে এবং আত্মপর্যালোচনা করার মাধ্যমে রযমানের রাত্রিতে উঠে নামায পড়ে তার অতীতের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়।

(বুখারী, কিতাবুস সওম)

রমযানের শেষ দশদিনে এতেকাফে বসার রীতি

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন: আঁ হযরত (সা.) রমযান মাসের শেষ দশ দিন একেতাফে বসতেন আর তিনি আমৃত্যু এই রীতিই অনুসরণ করে এসেছেন। এরপর তাঁর পবিত্র সহধর্মিনীরা এই দিনগুলিতে এতেকাফে বসতেন।

(বুখারী, কিতাবুল এতেকাফ)

মিথ্যা থেকে বিরত থাকা

হযরত আবু হুরাইরাহ (রা.) বর্ণনা করেন, আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা ও মিথ্যা কর্ম থেকে বিরত হয় না, আল্লাহ্ তা'লার তার ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত থাকার প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ তার রোযা রাখা কোনো উপকারে আসে না।

(বুখারী, কিতাবুস সওম)

সূর্যাস্ত হলে রোযা ইফতার করা উচিত

হযরত উমর (রা.) বর্ণনা করেন, আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: দিন অতিক্রান্ত হয়ে রাত্রি নামলে অর্থাৎ সূর্যাস্ত হলে রোযাদারের উচিত রোযা ইফতার করা। (বুখারী, কিতাবুস সওম)

অবাধ্য ও অনুগতদের মাঝে পার্থক্য নিরুপণের জন্য রোযা তুলাদন্ড সদৃশ

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পবিত্র বাণী

দুঃখের বিষয় এই যে, মুসলমানেরা নিজেরাই শরিয়তের অবমাননা করে। যেমন দেখুন, আজকাল যারা রোযা রেখেছে তারা মোটেই শীর্ণকায় হয়ে পড়ে নি। আর যারা অবহেলায় এই মাস অতিবাহিত করেছে তারা স্থুলকায় হয়ে যায় নি। তাদেরও সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে। শীতকালের রোযা ছিল, তাই খাওয়ার সময়েই পরিবর্তন হয়েছিল, সাত-আটটার সময় না খেয়ে চারটে বা পাঁচটার সময় খেয়েছে। এতটা ছাড় দেওয়া সত্বেও অনেকে আল্লাহ্ তা'লার এই নিদর্শনকে মহত্ব দেয় নি আর খোদা তা'লার এই সম্মানযোগ্য ও পবিত্র রমযান মাসকে নিতান্ত অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখেছে। এমন সহজ মাসে রমযানের আগমণ এক ধরণের মানদণ্ড ছিল আর অবাধ্য ও অনুগতদের মাঝে পার্থক্য নিরুপণের জন্য রোযা তুলাদন্ড সদৃশ। খোদা তা'লার পক্ষ থেকে সহজসাধ্যতা ছিল। সরকার সব ধরণের স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছে। নানান ধরণের ফলমূল এবং আহার সহজলভ্য হয়ে উঠেছে। এমন কোন ভোগ্যপণ্য নেই যা বর্তমান সময়ে দুর্লভ। এতদ্সত্বেও কোন ভ্রুক্ষেপ করা হল না, এর কারণ কি? এর কারণ অন্তরে খোদার প্রতি আর ঈমান অবশিষ্ট নেই। ..... যেন এমন ধারণা বদ্ধমূল হয়ে বসেছে যে খোদার সঙ্গে কখনও কোনও সংস্রব থাকবে না, কখনও তাঁর দ্বারস্থ হতে হবে না,তাঁর আদালতে কখনও যেতেই হবে না। অস্বীকারকারীরা যদি ভেবে দেখত! সহস্র কোটি সূর্যের জ্যোতির চেয়েও খোদা তা'লার অস্তিত্বের প্রমাণ বেশি শক্তিশালী।পরিতাপ! পায়ের জুতো দেখে নিশ্চিত অনুমান করা যায় যে এর কোনও নির্মাতা আছে, কিন্তু খোদা তা'লার অগণিত সৃষ্টিরাজি দেখেও তাঁর প্রতি ঈমান না থাকা কি ধরণের হঠকারিতা? কিম্বা এমন ঈমান থাকা যা না থাকার নামান্তর। আমাদের প্রতি খোদা তা'লার অশেষ কৃপারাজি রয়েছে।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৩১)

দুর্বলতা জাতীয় অজুহাতকে সামনে রেখে রোযা ত্যাগ করার সুযোগ সন্ধান করা হয়, এই সংযম অনুশীলনের জন্যই তো রোযা রাখা হয়। রোযা এজন্য মানুষকে থাকার আদেশ দেওয়া হয় নি যে তার কোন কষ্টই হবে না আর সে কোন দুর্বলতা অনুভব করবে না। বরং রোযা রাখার আদেশ এই কারণে দেওয়া হয়েছে যাতে সে দুর্বলতা সহনে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে।

হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন: রোযার প্রতি শরিয়তে অনেক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। একদিকে যেমন রোযার বিষয়ে মাত্রাধিক কট্টরতা অবৈধ তেমনি মাত্রাধিক শিথিলতাও অবৈধ। এতটা কঠোরতাও করা উচিত নয় যে প্রাণ যাওয়ার উপক্রম হয় আবার এতটা শিথিলতাও দেখানো উচিত নয় যাতে শরিয়তের আদেশের অবমাননা হয় আর বিভিন্ন ছুতোয় দায়িত্ব এড়ানো হয়। আমি দেখেছি, অনেকে কেবল দুর্বলতার অজুহাতে রোযা রাখে না। কেউ কেউ আবার বলে রোযা রাখলে আমাশয় হয়। অথচ এগুলি রোযা ত্যাগ করার কোন বৈধ অজুহাত নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত আমাশয় না হয় রোযা রাখা জরুরী। (রোযা রাখা অবস্থায়) আমাশয় হলে রোযা ত্যাগ করতেও পারে। অনুরূপভাবে কেউ কেউ বলে, রোযা রাখলে তারা দুর্বল হয়ে পড়ে। কিন্তু এটাও কোন যুক্তি নয়। কেবল সেই দুর্বলতার কারণে রোযা ত্যাগ করা বৈধ যখন ডাক্তার রোযা রাখতে নিষেধ করে। অন্যথায় দুর্বলতা তো অনেকের নিত্যসঙ্গী। তবে কি তারা কখনও রোযা রাখবে না? আড়াই- বা তিন বছর আমার বয়স ছিল, যখন আমার কালো কাশি হয়েছিল। সেই তখন থেকে আমার শরীর অসুস্থ। যদি এমন অসুস্থতার অজুহাত দেওয়া বৈধ হয় তবে হয়তো আমার আজীবন একটি রোযার সুযোগ হত না। এই যে দুর্বলতা জাতীয় অজুহাতকে সামনে রেখে রোযা ত্যাগ করার সুযোগ সন্ধান করা হয়, এই সংযম অনুশীলনের জন্যই তো রোযা রাখা হয়। যেমনটি এর উপমা কুরআন করীমে বর্ণিত হয়েছে- নামায অসৎ কর্ম এবং অশ্লীলতা থেকে মানুষকে বিরত রাখে। এখন যদি কেউ বলে, আমি নামায এজন্য পড়ি না যে এর কারণে অসৎ কর্ম করা থেকে আমি বাধাপ্রাপ্ত হই। অতএব, রোযার উদ্দেশ্যই তো দুর্বলতা সহন করার অভ্যেস গড়ে তোলা। নচেত যে কেউ বলতে পারে যে সে রোযা রাখে না কারণ ক্ষুধা ও পিপাসা তার জন্য কষ্টকর। অথচ এই ধরণের কষ্ট সহন করার অভ্যাস গড়ে তোলার জন্যই রোযা নির্ধারিত হয়েছে। যে ব্যক্তি রোযা রাখে, সে কি চায় ফিরিশতারা সারা দিন তার পেটে কাবাব ঠুসে ভরতে থাকবে?সে রোযা রাখলে তাকে অবশ্যই ক্ষুদপিপাসা সহন করতে হবে আর কিছুটা দুর্বলতাও হবে। এই দুর্বলতা সহন করার অভ্যাস গড়ে তোলর জন্য রোযা রাখা হয়। রোযার অবশ্য আরও অন্যান্য অন্তর্নিহিত প্রজ্ঞা রয়েছে। যেমন রোযা রাখলে অভাবপীড়িত ও অভুক্ত মানুষদের সাহায্যের প্রতি মনোযোগ সৃষ্টি হয়। কিন্তু আর যাইহোক রোযা এজন্য মানুষকে থাকার আদেশ দেওয়া হয় নি যে তার কোন কষ্টই হবে না আর সে কোন দুর্বলতা অনুভব করবে না। বরং রোযা রাখার আদেশ এই কারণে দেওয়া হয়েছে যাতে সে দুর্বলতা সহনে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। অতএব, দুর্বলতার ভয়ে রোযা ত্যাগ করা কোনওক্রমেই বৈধ নয়। (তফসীর কবীর, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৮৬)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

জুমআর খুতবা

হযরত হিন্দ (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) সুস্থ আছেন, কাজেই সব বিপদাপদ এখন তুচ্ছ

হযরত হামযা (রা.)-র বিয়োগ বেদনায় মহানবী (সা.) জীবনের শেষ পর্যন্ত জর্জরিত ছিলেন, তিনি সর্বদা এর উল্লেখ করতেন।

মহানবী (সা.) মৃতদের জন্য বিলাপ করা অবৈধ আখ্যা দিয়েছেন আর সকল প্রকার ক্রন্দন ও বিলাপ নিষিদ্ধ আখ্যা দেন। এভাবে পরম প্রজ্ঞার সাথে মহানবী (সা.) আনসারের নারীদের আবেগের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন।

হে আল্লাহ্! ঈমানকে আমাদের প্রিয় বানিয়ে দাও আর এটি আমাদের হৃদয়ে প্রোথিত করে দাও। আর কুফর, পাপ ও অবাধ্যতাকে আমাদের দৃষ্টিতে অপছন্দনীয় করে দাও আর আমাদেরকে সরল-সোজা পথে পরিচালিতদের অন্তর্ভুক্ত করো। হে আল্লাহ্! আমাদেরকে আত্মসমর্পণকারী অবস্থায় মৃত্যু দাও আর আমাদেরকে আত্মসমর্পণকারী অবস্থায় পুনরুত্থিত করো। আর আমাদেরকে পুণ্যবানদের সাথে এমনভাবে সম্পৃক্ত করো যেন আমরা লাঞ্ছিত না হই আর না-ই নৈরাজ্যের শিকার হই। হে আল্লাহ্! আমরা এই দারিদ্রাবস্থায় তোমার কাছে অনুগ্রহরাজি যাচনা করছি। হে আল্লাহ্! আমরা তোমার নিকট ভয়ের দিনে নিরাপত্তা যাচনা করছি। আর উপোসের দিনে প্রাচুর্যতা যাচনা করছি।

নুসায়বা মাযিনিয়্যা অর্থাৎ হযরত উম্মে আম্মারা (রা.) ছাড়া অন্য কোনো মহিলার ক্ষেত্রে একথা সাব্যস্ত নয় যে, তিনি উহুদের দিন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

হযরত উম্মে আম্মারা (রা.) তাঁর নিকট নিবেদন করেন, আল্লাহ্‌র কাছে আমাদের জন্য দোয়া করুন- আমরা যেন জান্নাতে আপনার সাথি হই। তিনি (সা.) দোয়া করে বলেন, হে আল্লাহ্! তাদেরকে জান্নাতে আমার বন্ধু ও সাথি বানিয়ে দাও। সে সময় হযরত উম্মে আম্মারা (রা.) বলেন, পৃথিবীতে আমার সাথে কী ঘটবে সে ব্যাপারে আমার আর ভ্রুক্ষেপ নেই।

উহদের যুদ্ধে শহীদ হওয়া সাহাবাদের শেষকৃত্য, যুদ্ধে মহিলা সাহাবীয়াদের অসম সাহসিকতার পরিচয় এবং আঁ হযরত (সা.)-এর প্রতি অনুরাগ সংক্রান্ত ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলী

শোক সংবাদ: মাননীয় গাসসান খালিদ নাকিব সাহেব, মাননীয়া নওশাবা মুবারক (মুরুব্বী সিলসিলা জালিস আহমদ সাহেবের স্ত্রী), মাননীয় রাজিয়া সুলতানা সাহেবা (মাননীয় আব্দুল হামীদ খান সাহেবের স্ত্রী), মাননীয়া বুশরা বেগম সাহেবা (মাননীয়া ডক্টর মহম্ম সেলিম সাহেবের স্ত্রী) এবং মাননীয় রশীদ আহমদ সাহেব (নরওয়ে)-এর স্মৃতিচারণ ও জানাযা গায়েব

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ১লা মার্চ , ২০২৪, এর জুমুআর খুতবা (১ আমান, ১৪০৩ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) উহুদের যুদ্ধের অবস্থার প্রেক্ষিতে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) আহত ও শহীদদের একত্রিত করেন। আর আহতদের চিকিৎসা করা হয় এবং শহীদদের দাফনের ব্যবস্থা করা হয়। তখন তিনি জানতে পারেন যে, মক্কার অত্যাচারী কাফিররা কতক মুসলমান শহীদের নাক, কান কেটে দিয়েছে। যেমন, যাদের নাক কান কাটা হয়েছে তাদের মাঝে স্বয়ং তাঁর (সা.) চাচা হামযা (রা.)ও ছিলেন। তিনি (সা.) এই দৃশ্য দেখে দুঃখভারাক্রান্ত হন। তিনি (সা.) বলেন, কাফিররা স্বয়ং নিজেদের ব্যবহারিক আচরণের মাধ্যমে নিজেদের ক্ষেত্রে সেই প্রতিশোধকে বৈধ করে দিয়েছে যেটিকে আমরা অবৈধ মনে করতাম। কিন্তু খোদা তা'লার পক্ষ থেকে তখন তাঁর (সা.) প্রতি ওহী হয় যে, কাফিররা যা কিছু করে তা তাদেরকে করতে দাও। তুমি দয়া ও ন্যায়বিচারের আঁচল সর্বদা আঁকড়ে ধরে রেখো।"

(দিবাচা তফসীরুল কুরআন, আনোয়ারুল উলুম, ২০তম খণ্ড, পৃ: ২৫৪-২৫৫)

এটি হলো ইসলামের শিক্ষা। হযরত হামযা (রা.)-র দাফন-কাফন সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, কাফন হিসেবে হযরত হামযা (রা.)-কে একটি কাপড়েই সমাহিত করা হয়। এ সম্পর্কে আমি পূর্বেই বিস্তারিত বর্ণনা করেছি অবশ্য কিছু কথা রয়ে গিয়েছিল, যখন তার মাথা ঢাকা হতো উভয় পা হতে কাপড় সরে যেতো। আর যখন চাঁদর পায়ের দিকে টানা হতো তখন তার চেহারা থেকে কাপড় সরে যেতো। তখন আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) বলেন, তার মুখমণ্ডল ঢেকে দেওয়া হোক আর পায়ের ওপর হারমাল বা ইযখার ঘাস রেখে দেয়া হোক। হযরত হামযা (রা.) এবং হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশ (রা.)-কে, যিনি তার ভাগ্নে ছিলেন, একই কবরে সমাহিত করা হয়। মহানবী (সা.) সর্বপ্রথম হযরত হামযা (রা.)-র জানাযার নামায পড়ান।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৬-৭) (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বাল, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৭২, হাদীস-২১৩৮৭)

শহীদদের জানাযার নামায পড়া বা না পড়া সম্পর্কে এটি হলো উদ্ধৃতি, যা আমি গত খুতবায় বর্ণনা করেছি। মৃতদের জন্য যে ক্রন্দন ও বিলাপ করা হয়, মহানবী (সা.) কতই না প্রজ্ঞাপূর্ণ পন্থায় এটিকে নিষেধ করেছেন।

একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, আর এটি হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.)-র বর্ণনা যে, মহানবী (সা.) যখন উহুদ থেকে ফিরে আসেন তখন তিনি (সা.) শুনতে পান যে, আনসারের নারীরা তাদের স্বামীদের জন্য ক্রন্দন ও বিলাপ করছে। তিনি (সা.) বলেন, ব্যাপার কী, হামযার নাম নিয়ে বিলাপ করার কেউ নাই না-কি? আনসারের নারীরা যখন জানতে পারেন তখন তারা হযরত হামযা (রা.)-র শাহাদতে বিলাপ করার জন্য একত্রিত হন। এরপর মহানবী (সা.) তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। তিনি কিছুটা দূরত্বে ছিলেন, আমার মনে হয় মসজিদেই ছিলেন। তিনি যখন জাগ্রত হন তখন সেই নারীরা সেভাবেই ক্রন্দনরত ছিলেন। মহানবী (সা.) বলেন, আজ হামযার জন্য তারা কী কেঁদেই যাবে, বন্ধ করবে না। তাদেরকে বলে দাও, যেন বাড়ি ফিরে যায়। তখন মহানবী (সা.) তাদেরকে নির্দেশ দেন, নিজ নিজ

বাড়িতে ফিরে যাও। আর আজকের পর কোনো মৃত্যু বরণকারীর জন্য মাতম বা বিলাপ করবে না।

(মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বাল, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪১৮-৪১৯, হাদীস-৫৫৬৩)

এভাবে মহানবী (সা.) মৃতদের জন্য বিলাপ করা অবৈধ আখ্যা দিয়েছেন আর সকল প্রকার ক্রন্দন ও বিলাপ নিষিদ্ধ আখ্যা দেন। এভাবে পরম প্রজ্ঞার সাথে মহানবী (সা.) আনসারের নারীদের আবেগের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। তাদেরকে তাদের স্বামী ও ভাইদের মৃত্যুতে বিলাপ করতে নিষেধ করার পরিবর্তে হযরত হামযা (রা.)-র উল্লেখ করেন যে, তার জন্য কাঁদার কেউ কি নেই? মহানবী (সা.) হযরত হামযা (রা.)-র শাহাদতের পর তার লাশের অসম্মান বা অবমাননা দেখে খুবই মর্মাহত ছিলেন, কিন্তু যখন তিনি দেখেন যে, এই আনসার নারীরা বিলাপ করা বন্ধই করছে না তখন তিনি (সা.) এই প্রথা নির্মূল করার জন্য, (যা কুপ্রথাই ছিল,) নিজের আদর্শ উপস্থাপন করেন আর তাদেরকে ধৈর্য ধারণের শিক্ষা দেন। (এটি) এমন শিক্ষা যা ছিল খুবই কার্যকরী।

হযরত হামযা (রা.)-র বিয়োগ বেদনায় মহানবী (সা.) জীবনের শেষ পর্যন্ত জর্জরিত ছিলেন, তিনি সর্বদা এর উল্লেখ করতেন।

হযরত কা'ব বিন মালেক (রা.) হযরত হামযা (রা.)-র শাহাদতে নিজের শোকগাথায় বলেছিলেন, 'আমার চোখ অশ্রু বিসর্জন দেয়, আর হামযার মৃত্যুতে তাদের ক্রন্দন করার বৈধ অধিকারও রয়েছে। কিন্তু খোদার সিংহের মৃত্যুতে কান্নাকাটি এবং চিৎকার চেঁচামেচিতে কী-ইবা লাভ হতে পারে। সেই খোদার সিংহ হামযা, যে সকালে তিনি শহীদ হন জগৎ বলে উঠে যে, এই বীরের শাহাদতই প্রকৃত শাহাদত।'

(উসদুল গাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ৬৯)

হযরত মুসআব (রা.)-র দাফন সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) যখন হযরত মুসআব (রা.)-র লাশের কাছে আসেন তখন তার লাশ উপুড় হয়ে পড়ে ছিল। মহানবী (সা.) তার পাশে দাঁড়িয়ে এই আয়াত পাঠ করেন, مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضٰى نَحْبَهٗ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلًا অর্থাৎ, মু'মিনদের মাঝে এমন পুরুষরা রয়েছে যারা যে বিষয়ে আল্লাহ্‌র সাথে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছে তারা সেটিকে পূর্ণ করে দেখিয়েছে। অতএব, তাদের মাঝে সে-ও রয়েছে যে নিজের অঙ্গীকার রক্ষা করেছে আর তাদের মাঝে সে-ও রয়েছে যে এখনো অপেক্ষারত আছে। আর তারা নিজেদের কর্মপদ্ধতিতে কোনো পরিবর্তন আনে নি (সূরা আল-আহযাব: ২৪)। এরপর মহানবী (সা.) বলেন, إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ يَشْهَدُ أَنَّكُمُ الشُّهَدَاءُ عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ । অর্থাৎ, খোদার রসূল সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তোমরা কিয়ামত দিবসেও আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে শহীদ। অতঃপর তিনি (সা.) সাহাবীদের সম্বোধন করে বলেন, তাদের দর্শন করে নাও এবং তাদের প্র তি সালাম প্রেরণ করো। সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ! কিয়ামত দিবস পর্যন্ত যে-ই তাদের প্রতি সালাম প্রেরণ করবে তারা তাদের সালামের উত্তর প্রদান করবেন। হযরত মুসআব (রা.)-র ভাই হযরত আবু রুম বিন উমায়ের, হযরত সুয়ায়বাত বিন সা'দ এবং হযরত আমের বিন রবীয়্যা (রা.) হযরত মুসআব (রা.)- কে কবরে নামান।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৮৯-৯০)

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব সীরাত খাতামান্ নবীঈন পুস্তকে লিখেন,

"উহুদের শহীদদের মাঝে একজন ছিলেন মুসআব বিন উমায়ের (রা.)। তিনি ছিলেন সেই সর্বপ্র থম মুহাজির, যিনি মদীনায় ইসলামের মুবাল্লিগ বা প্রচারক হিসেবে এসেছিলেন। অজ্ঞতার যুগে মুসআব (রা.) মক্কার যুবকদের মাঝে সবচেয়ে সুন্দর ও মার্জিত পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করতেন আর প্রাচুর্য ও বিলাসিতার মাঝে জীবন কাটাতেন। ইসলাম গ্রহণের পর তার অবস্থা সম্পূর্ণ পাল্টে যায়। রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) একবার তার দেহে একটি পোশাক দেখেন যেটিতে বেশ কিছু তালি দেওয়া ছিল। মহানবী (সা.)-এর তখন তার সেই পূর্বের যুগের কথা স্মরণ হলে তিনি (সা.) অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়েন, অর্থাৎ তাঁর চোখে পানি নেমে আসে। উহুদের যুদ্ধে যখন হযরত মুসআব (রা.) শহীদ হন তখন তার কাছে এতটুকু কাপড়ও ছিল না যা দ্বারা তার দেহ ঢাকা যেত। পা ঢাকলে মাথা খালি হয়ে যেত, মাথা ঢাকলে পা বেরিয়ে যেত। তখন মহানবী (সা.)-এর নির্দেশে মাথা কাপড় দ্বারা ঢেকে পা ঘাস দ্বারা আবৃত করা হয়। "

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, প্রণেতা-মির্যা বশীর আহমদ এম.এ, পৃ: ৫০১)

উহুদের দিন যুদ্ধের পর মহানবী (সা.) একটি দোয়াও করেছেন। এ বিষয়ে উল্লেখ পাওয়া যায় যে, হযরত রিফা' বিন রাফে' যুরাকী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) সাহাবীদের দাফনকার্য সম্পন্ন করার পর নিজের ঘোড়ায় আরোহণ করেন, তখন মুসলমানরা তাঁর চতুষ্পার্শ্বে ছিলেন। (তাদের) অধিকাংশই আহত ছিলেন। আর বনু সালামা এবং বনু আব্দেল আশআল গোত্রের (লোকেরাই) বেশি আহত ছিল। এছাড়া তাঁর সাথে চৌদ্দজন মহিলাও ছিলেন। উহুদ (পাহাড়ের) নীচে পৌঁছার পর তিনি (সা.) বলেন, তোমরা সবাই সারিবদ্ধ হও যাতে আমি আমার মহান প্রভুর প্রশংসা কীর্ত্তন করতে পারি। তখন তাঁর পেছনে পুরুষরা সারিবদ্ধ হয় আর তাদের পেছনে মহিলারা (সারিবদ্ধ হয়ে) দাঁড়ায়। এরপর মহানবী (সা.) এসব বাক্য বলেন,

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهٗ. اَللّٰهُمَّ لَا قَابِضَ لِمَا بَسَطْتَ، وَلَا بَاسِطَ لِمَا قَبَضْتَ، وَلَا هَادِيَ لِمَنْ أَضْلَلْتَ، وَلَا مُضِلَّ لِمَنْ هَدَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُقَرِّبَ لِمَا بَاعَدْتَ وَلَا مُبْعِدَ لِمَا قَرَّبْتَ. اَللّٰهُمَّ ابْسُطْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَفَضْلِكَ وَرِزْقِكَ. اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ النَّعِيْمَ الْمُقِيْمَ الَّذِيْ لَا يَحُوْلُ وَلَا يَزُوْلُ. اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ النَّعِيْمَ يَوْمَ الْعَيْلَةِ. اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ الْأَمْنَ يَوْمَ الْخَوْفِ. وَالْغِنٰى يَوْمَ الْفَاقَةِ. اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ عَائِذٌ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا أَعْطَيْتَنَا وَمِنْ شَرِّ مَا مَنَعْتَنَا. اَللّٰهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْإِيْمَانَ وَزَيِّنْهُ فِيْ قُلُوْبِنَا، وَكَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَ الْعِصْيَانَ وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِيْنَ. اَللّٰهُمَّ تَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ وَأَحْيِنَا مُسْلِمِيْنَ، وَأَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِيْنَ غَيْرَ خَزَايَا وَلَا مَفْتُوْنِيْنَ. اَللّٰهُمَّ قَاتِلِ الْكَفَرَةَ الَّذِيْنَ يُكَذِّبُوْنَ رُسُلَكَ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِكَ، وَاجْعَلْ عَلَيْهِمْ رِجْزَكَ وَعَذَابَكَ. اَللّٰهُمَّ قَاتِلِ الْكَفَرَةَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتَابَ إِلٰهَ الْحَقِّ. [آمين]۔

অর্থাৎ, হে আল্লাহ্! যাবতীয় সকল প্রশংসা তোমারই জন্য। হে আল্লাহ্! যে জিনিসকে তুমি সম্প্রসারিত করো তাকে কেউ সংকীর্ণ করতে পারে না। আর যে জিনিসকে তুমি সংকীর্ণ করো তাকে কেউ সম্প্রসারিত করতে পারে না। আর যাকে তুমি পথভ্রষ্ট করে দাও তাকে কেউ হিদায়াত দিতে পারে না। আর যাকে তুমি হিদায়াত দাও তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না। আর যা তুমি রোধ করে রাখো বা না দাও তা কেউ দিতে পারে না। আর যা তুমি দান করো তা কেউ রোধ করতে পারে না। আর যাকে তুমি দূরে ঠেলে দাও তাকে কেউ নৈকট্য প্রদান করতে পারে না। আর যাকে তুমি নৈকট্য দান করো তাকে কেউ দূরে ঠেলে দিতে পারে না। হে আল্লাহ্! আমাদের প্রতি তোমার কল্যাণরাজি, অনুগ্রহ, স্বীয় কৃপা ও রিয্ ক-এ স্বাচ্ছন্দ্য দান করো। হে আল্লাহ্! আমরা তোমার নিকট তোমার এমন সুপ্রতিষ্ঠিত অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি যা কখনো ফিরিয়ে নেওয়া হবে না কিংবা শেষ হবে না। হে আল্লাহ্! আমরা এই দারিদ্রাবস্থায় তোমার কাছে অনুগ্রহরাজি যাচনা করছি। হে আল্লাহ্! আমরা তোমার নিকট ভয়ের দিনে নিরাপত্তা যাচনা করছি। আর উপোসের দিনে প্রাচুর্যতা যাচনা করছি। হে আল্লাহ্! আমরা তোমার নিকট সেসব জিনিসের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি যা তুমি আমাদের দান করেছ। আর সেসব জিনিসের অনিষ্ট থেকেও আশ্রয় প্রার্থনা করছি যা তুমি আমাদের জন্য বারণ করেছ। হে আল্লাহ্! ঈমানকে আমাদের প্রিয় বানিয়ে দাও আর এটি আমাদের হৃদয়ে প্রোথিত করে দাও। আর কুফর, পাপ ও অবাধ্যতাকে আমাদের দৃষ্টিতে অপছন্দনীয় করে দাও আর আমাদেরকে সরল-সোজা পথে পরিচালিতদের অন্তর্ভুক্ত করো। হে আল্লাহ্! আমাদেরকে আত্মসমর্পণকারী অবস্থায় মৃত্যু দাও আর আমাদেরকে আত্মসমর্পণকারী অবস্থায় পুনরুত্থিত করো। আর আমাদেরকে পুণ্যবানদের সাথে এমনভাবে সম্পৃক্ত করো যেন আমরা লাঞ্ছিত না হই আর না-ই নৈরাজ্যের শিকার হই। হে আল্লাহ্! সেসব কাফিরকে ধ্বংস করে দাও যারা তোমার রসূলদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে আর তোমার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এবং তাদের ওপরে তোমার শাস্তি ও আযাব অবতীর্ণ করো। হে আল্লাহ্! হে সত্যিকার উপাস্য! আহলে কিতাব কাফিরদেরকে ধ্বংস করে দাও, আমীন।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ২২৭)

এই দোয়াটি তিনি (সা.) তখন সবাইকে একত্রিত করে পাঠ করেন।

উহুদের যুদ্ধে মহিলা সাহাবীদের ভূমিকা সম্পর্কে আমি পূর্বে ও উল্লেখ করেছিলাম, (আজ) আরো কিছু উল্লেখ করছি।

উহুদের যুদ্ধে যেখানে পুরুষরা আত্মনিবেদনের ইতিহাস রচনা করেছেন সেখানে নারীরাও এই সেবায় মুসলমান সৈনিকদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন। হযরত উম্মে সালামা (রা.) সম্পর্কে রেওয়ায়েতে উল্লেখ পাওয়া যায় যে, তিনি উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

যেমন, হযরত মুত্তালিব বিন আব্দুল্লাহ্ বিন হান্তাব (রা.) বর্ণনা করেন, উহুদ অভিমুখে যাত্রার দিন মহানবী (সা.) পথিমধ্যে মদীনার নিকটবর্তী 'শায়খাইন' নামক একটি স্থানে রাত্রিযাপন করেন। সেখানে হযরত উম্মে সালামা (রা.) (ছাগলের) একটি কষা রান নিয়ে আসেন এবং মহানবী (সা.) তা থেকে আহার করেন। এরপর 'নবীয' (এক প্রকার পানীয়) আনেন আর মহানবী (সা.) 'নবীয' পান করেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমার ধারণা, এটি 'হারীরা'র মতো কোনো পানীয় ছিল।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৬৭)

হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, উহুদের দিন আমি হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) এবং আমার মাতা উম্মে সুলায়েম (রা.)-কে দেখেছি। তারা মশক ভর্তি করে পানি আনতেন এবং তৃষ্ণার্তদের পান করাতেন। বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, উহুদের দিন লোকেরা যখন পরাজয়ের পর ছত্রভঙ্গ হয়ে মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে দূরে চলে যায় আমি হযরত আয়েশা বিনতে আবু বকর (রা.) এবং হযরত উম্মে সুলায়েম (রা.)-কে দেখেছি তারা নিজেদের কাপড় বা পরিধেয় বস্ত্র শক্তকরে কোমরে বেঁধে রেখেছিলেন আর আমি তাদের উভয়ের পাদাভরণ দেখছিলাম। তারা উভয়ে দ্রুতবেগে মশক নিয়ে যাচ্ছিলেন। এছাড়া আরেকটি বর্ণনায় অন্য একজন বলেন, তারা উভয়ে নিজেদের কোমরে করে মশক বহন করছিলেন এবং তারা উভয়ে তা লোকদের মুখে ঢেলে দিতেন অর্থাৎ পানি পান করাতেন। এরপর তারা উভয়ে ফিরে গিয়ে পুনরায় সেগুলো ভরে নিয়ে আসতেন এবং লোকদের মুখে পানি ঢেলে দিতেন।

(সহীহ বুখারী, কিতাবুল জিহাদ, হাদীস-২৮৮০)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.)-র মাতা উম্মে সুলায়েত (রা.)ও অনেক দূর থেকে পানির মশক ভরে নিয়ে আসতেন এবং অপরদিকে আহত ও পিপাসার্তদের পানি পান করাতেন। হযরত উম্মে আতীয়া (রা.)ও এই সেবা প্রদান করেছিলেন। অন্য কয়েকজন মহিলা রীতিমতো বর্শা ও তরবারি হাতে নিয়ে শত্রুদের সাথে মুখোমুখি যুদ্ধও করেন। তাদের মধ্যে একজন হলেন, হযরত উম্মে আম্মারা (রা.), যেমনটি আমি বিগত খুতবায় বর্ণনা করেছি। তিনি যখন ইবনে কামিয়াকে মহানবী (সা.)-এর ওপর আক্রমণোদ্যত দেখতে পান তখন নির্ভীকভাবে আরবের দুর্ধর্ষ অশ্বারোহীকে প্রতিরোধে উদ্যত হন এবং তার ওপর উপর্যু পরি আক্রমণ করে তাকে পিছু হটতে বাধ্য করেন।

(গাযওয়াত ওয়াস সারায়া, প্রণেতা-মহম্মদ আজহার ফরিদ, পৃ: ১৯৮)

ইবনে আবী শেয়বা এবং ইমাম আহমদ বিন হাম্বল উভয়ে আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা.)-র বরাতে বর্ণনা করেন, উহুদের দিন মহিলারা মুসলমানদের এগিয়ে যাওয়ার পর আহত মুশরিকদের মৃত্যু নিশ্চিত করতেন।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ২০৩)

কোনো কোনো মহিলা সাহাবী (রা.) যুদ্ধের পরে উহুদ প্রান্তরে আসেন।

যেমনটি বর্ণিত হয়েছে, মুশরিক দের চলে যাবার পর কিছু মহিলা সাহাবীদের কাছে আসেন, তাদের মাঝে মহানবী (সা.)-এর কন্যা হযরত ফাতেমা (রা.)ও ছিলেন। মহানবী (সা.)-কে দেখে তিনি জড়িয়ে ধরেন। তিনি তাঁর ক্ষত ধৌত করতে আরম্ভ করেন এবং হযরত আলী (রা.) ঢালের সাহায্যে পানি ঢালেন, কিন্তু অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ হচ্ছিল। (তাই) হযরত ফাতেমা (রা.) চাটাইয়ের কিছু অংশ পুড়ে ছাই তৈরী করে ক্ষতস্থানে লগিয়ে দেন, অবশেষে তা ক্ষতস্থানে লেপটে গেলে রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ২১০)

হযরত আয়েশা (রা.) উহুদ যুদ্ধের সংবাদ নেওয়ার জন্য মদীনার মহিলাদের সাথে বাড়ি থেকে বের হন। তখনও পর্দার আদেশ অবতীর্ণ হয়নি। হযরত আয়েশা (রা.) যখন 'হাররা' নামক স্থানে পৌঁছেন তখন তার সাথে হিন্দ বিনতে আমর (রা.)-র সাথে সাক্ষাৎ হয়। তিনি হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর (রা.)-র বোন ছিলেন। হযরত হিন্দ (রা.) তার উটনীকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। সেই উটনীর পীঠে তার স্বামী হযরত আমর বিন জমুহ (রা.), পুত্র হযরত খাল্লাদ বিন আমর (রা.) এবং ভাই হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর (রা.)-র মরদেহ ছিল। তিনজনের লাশ ছিল উটের পিঠে। হযরত আয়েশা (রা.) যখন রণক্ষেত্রের সংবাদ জানার চেষ্টা করছিলেন। তখন হযরত আয়েশা (রা.) তাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কী অবস্থায় লোকদের পেছনে রেখে এসেছ তা কি তুমি জানো? এর উত্তরে হযরত হিন্দ (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) সুস্থ আছেন, কাজেই সব বিপদাপদ এখন তুচ্ছ।

নিজের তিনজন নিকটাত্মীয় যথা: স্বামী, সন্তান এবং ভাইয়ের শবদেহ বহন করছেন কিন্তু (তাঁর মানসিক অবস্থা) জিজ্ঞেস করাতে উত্তরে বলেন, মহানবী (সা.) নিরাপদ থাকলেই হলো। এদেরকে তো আমি এখনই দাফন করব; মহানবী (সা.) যেহেতু ভালো আছেন তাই এগুলো কোনো বিষয়ই না!

(কিতাবুল মাগাযি, ১ম খণ্ড, পৃ: ২৩২-২৩৩)

হযরত উম্মে আম্মারা (রা.) বর্ণনা করেন, উহুদের যুদ্ধের দিন আমি এটি দেখার জন্য বের হই যে, মানুষ কী করছে। আমার কাছে পানি ভর্তি মশক ছিল যেটি আমি আহতদের পান করানোর জন্য সাথে করে নিয়েগিয়েছিলাম। এক পর্যায়ে আমি মহানবী (সা.)-এর কাছে গিয়ে উপস্থিত হই। সে-সময় তিনি (সা.) সাহাবীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিলেন এবং মুসলমানদের পাল্লা ভারি ছিল। হঠাৎ করেই মুসলমানদের পরাজয় (শুরু) হয়। (এটি দেখে) আমি তাৎক্ষণিকভাবে মহানবী (সা.)-এর কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে লড়াই করতে আরম্ভ করি। আমি তরবারি দ্বারা শত্রুদের মহানবী (সা.)-এর কাছে আসতে বাধা দিচ্ছিলাম। পাশাপাশি আমি ধনুক দিয়ে তিরও নিক্ষেপ করছিলাম, এমতাবস্থায় আমি নিজেও আহত হয়ে যাই।

(সীরাতুল হালবিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩১৩)

একজন জীবনীকার বর্ণনা করেন, যে মহিলা উহুদের যুদ্ধের দিন যুদ্ধ করেন এবং পরাজয়ের সময় মহানবী (সা.)-কে রক্ষা করার জন্য অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করে তিরন্দাজী করেছিলেন তিনি ছিলেন হযরত উম্মে আম্মারা (রা.); আম্মারা নুসায়বা মাযিনিয়্যা ছিলেন।

(গাযাওয়ায়ে উহদ, প্রণেতা- মহম্মদ আহমদ হাশমিল, পৃ: ১৭১)

নুসায়বা মাযিনিয়্যা অর্থাৎ হযরত উম্মে আম্মারা (রা.) ছাড়া অন্য কোনো মহিলার ক্ষেত্রে একথা সাব্যস্ত নয় যে, তিনি উহুদের দিন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

তবে হ্যাঁ, ঐতিহাসিকরা বর্ণনা করেছেন যে, মুসলমানদের কিছু মহিলা মুশরিকরা সরে গেলে মদীনা থেকে রণক্ষেত্রে যান এবং তারা আহতদের সেবা-শুশ্রূষা এবং পানি পান করানো ইত্যাদি কাজে সম্পৃক্ত হন। সেসব মহিলার মাঝে ছিলেন মহানবী (সা.)-এর সহধর্মিনী হযরত আয়েশা (রা.), তাঁর (সা.) কন্যা ফাতেমাতুয্ যাহরা (রা.)। ইমাম বুখারী একজন রাবীর বর্ণনা উল্লেখ করেছেন যে, (বর্ণনাকারী বলেন,) আমি হযরত আয়েশা এবং হযরত উম্মে সুলায়েমকে দেখেছি। তারা উভয়ে দ্রুততার সাথে পানির মশক পিঠে তুলে দৌড়ে আসতেন এবং লোকদের মুখেপানি ঢেলে দিতেন। (সেগুলো খালি হয়ে গেলে) পুনরায় সেগুলো ভরে এনে পুনরায় মানুষের মুখে পানি ঢেলে দিতেন।

(গাযাওয়ায়ে উহদ, প্রণেতা- মহম্মদ আহমদ হাশমিল, পৃ: ১৭৫)

একজন লেখক লিখেন, যখন তুমুল যুদ্ধ শুরু হয় তখন মুসলমানদের কিছু মহিলা সাহায্য-সহযোগিতার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। ঐসব মহিলার মাঝে মহানবী (সা.)-এর সেবিকা হযরত উম্মে আয়মান (রা.)ও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ঐতিহাসিকরা বর্ণনা করেছেন, যখন মুসলমানদের পরাজিত দল মদীনায় ঢোকার চেষ্টা করে তখন উম্মে আয়মান (রা.) তাদের মুখোমুখি দাঁড়ান এবং মু ঠো মুঠো মাটি তাদের মুখে নিক্ষেপ করতে থাকেন আর কতককে ধমক দিয়ে বলেন, তোমারা যদি যুদ্ধ করতে না পারো তাহলে এই চরকা নাও; (চরকা হলো, যেটি দিয়ে মহিলারা সুতা কাটে, সুতা বানায়) এবং তোমাদের তরবারিগুলো আমাদেরকে দিয়ে দাও আর তোমরা মহিলাদের কাজ করো। একথা বলেই তিনি দ্রুত যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে উপস্থিত হন। মহানবী (সা.)-এর চারপাশে তুমুল যুদ্ধ চলাকালীন হযরত উম্মে আয়মান (রা.) আহতদের সেবা-শুশ্রূষার জন্য প্রস্তুত থাকতেন। এমনকি যুদ্ধ চলাকালীন সেবাশুশ্রূষার সময় তাদের দেহে তির এসে বিদ্ধ হতো। ইবনে আসীরের পুস্তক আল-কামেল ফীত-তারীখের (বর্ণনামতে) হযরত উম্মে আয়মান (রা.) যোদ্ধাদের মাঝে যারা আহত হতেন তাদেরকে পানি পান করাচ্ছিলেন। এ সময় হিব্বান বিন আরিকা তাকে লক্ষ্য করে তির নিক্ষেপ করে, ফলে তিনি পড়ে যান এবং অনাবৃত হয়ে পড়েন;এতে খোদার শত্রু খুব হাসাহাসি করে। মহানবী (সা.) এটি দেখে ভীষণ মর্মাহত হন। তিনি (সা.) হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রা.)-কে একটি তির দেন যেটির অগ্রভাগে ফলা ছিল না এবং বলেন, তাকে (তথা হিব্বানকে) লক্ষ্য করে নিক্ষেপ করো। হযরত সা'দ (রা.) তাকে লক্ষ্য করে তির নিক্ষেপ করেন ফলে সেই তির হিব্বানের বুকে গিয়ে আঘাত করে আর সে চিৎ হয়ে পড়ে যায় এবং উলঙ্গ হয়ে যায়। মহানবী (সা.) এটি দেখে মুচকি হাসেন। তিনি (সা.) বলেন, সা'দ উম্মে আয়মানের প্রতিশোধ নিয়েছে।

একজন জীবনীকার লিখেছেন, যুদ্ধের পরিসমাপ্তিতে কতিপয় মু'মিন নারী যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছান। জীবনীকার লিখেছেন, সেই মহিয়সী নারী তখন যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছান যখন মুসলমানরা মুশরিকদের পশ্চাদ্ধাবন করে এবং যখন বিজয়ের লক্ষ্মণাবলী প্রকাশ পেতে থাকে।

(গাযাওয়ায়ে উহদ, প্রণেতা- মহম্মদ আহমদ হাশমিল, পৃ: ১৭৬-১৭৭ (আররাহীকুল মাখতুম, পৃ: ৩৭৭) (সীরাত এনসাইক্লোপেডিয়া, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৩৯৩))

সারকথা হলো, প্রাথমিকভাবে তারা মুসলমান সৈন্যবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ছিল না। মুসলমান নারীরা সম্ভবত উহুদ প্রান্ত রে সেই সময় গিয়ে থাকবেন যখন মুসলমানদের প্রাথমিক বিজয়ের সংবাদ মদীনায় পৌঁছে। তারা এ সংবাদ শুনে উহুদ অভিমুখে যাত্রা করে, কিন্তু ততক্ষণে যুদ্ধক্ষেত্রের চিত্র পাল্টে যায়। এর ফলে মুসলমান নারীরাও যুদ্ধে অংশ নেয়।

দ্বিতীয়ত, এটিও হতে পারে যে, যখন মহানবী (সা.)-এর শাহাদতের সংবাদ পৌঁছে তখন এই নিবেদিতপ্রাণ নারীরাও ব্যাকুল হয়ে উহুদ অভিমুখে যাত্রা করে আর এরপর তারা যুদ্ধের অন্তিম মুহূর্তে এসে অংশগ্রহণ করে থাকবে; যখন এক দিকে প্রতিরক্ষামূলক আক্রমণ অব্যাহত ছিল আর অপরদিকে আহতদের সেবা-শুশ্রূষার কাজ চলছিল। যাহোক, আল্লাহ্ তা'লাই ভালো জানেন।

উহুদের যুদ্ধের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত সা'দ (রা.) বর্ণনা করেন, উহুদের দিন মহানবী (সা.) তার জন্য নিজের পিতামাতাকে একত্র করেন। তিনি বলেন, মুশরিকদের মাঝে এক ব্যক্তি মুসলমানদের মাঝে আগুন জ্বালিয়ে রেখেছে। মহানবী (সা.) হযরত সা'দ (রা.)-কে বলেন, তুমি তির নিক্ষেপ করো, তোমার জন্য আমার পিতামাতা উৎসর্গিত। পিতামাতাকে একত্রিত করার অর্থ হলো, তোমার জন্য আমার পিতামাতা নিবেদিত। হযরত সা'দ (রা.) বলেন, আমি ফলাবিহীন সেই তির তার দিকে নিক্ষেপ করি যার ফলে সে নিহত হয় এবং সে উলঙ্গ হয়ে যায় আর আমি দেখি, মহানবী (সা.) হাসছেন।

(সহীহ মুসলিম, কিতাবু ফাযাইলিস সাহাবা, হাদীস-৬২৩৭)

আরেকটি রেওয়ায়েতে এ ঘটনা এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, সেই মুশরিক যার নাম কতক ইতিহাসের পুস্তকে হিব্বান বলা হয়েছে- সে একটি তির নিক্ষেপ করে যা হযরত উম্মে আয়মান (রা.)'র দেহের এক পাশে বিদ্ধ হয়,যিনি আহতদের পানি পান করানোর কাজে ব্যস্ত ছিলেন। তখন হিব্বান হাসতে থাকে। মহানবী (সা.) হযরত সা'দ (রা.)-কে নিক্ষেপ করার জন্য একটি তির এগিয়ে দেন যা হিব্বানের গলায় বিদ্ধ হয় এবং সে পেছনে উল্টে পড়ে যার ফলে তার নগ্নতা প্রকাশ পেয়ে যায়। তখন মহানবী (সা.) হেসে ফেলেন। (আল আসাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৬৪)

মূলত মহানবী (সা.)-এর এই আনন্দ ও হাসি আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতাস্বরূপ ছিল, কেননা তিনি এক ভয়ংকর শত্রুকে এমন এক তির দ্বারাঘায়েল করেন যার ফলাও ছিল না। একটি সাধারণ লাঠি ছিল যা তাকে হত্যা করেছে।

একজন লেখক মহানবী (সা.)-এর সাহসিকতা এবং বিচক্ষণতার কথা উল্লেখ করে লিখেছেন, খালিদ বিন ওয়ালীদের নেতৃত্বে কুরাইশের অশ্বারোহীরা গিরিপথে অবস্থানকারী আব্দুল্লাহ্ বিন জুবায়ের (রা.) এবং তার সাথিদের শহীদ করে ইসলামী সৈন্যদলের পেছন থেকে এসে হামলা করে। সে সময় মহানবী (সা.)-এর সাথে কেবলমাত্র নয়জন সাহাবী ছিলেন। অন্যান্য মুজাহিদরা শত্রুদের পিছু ধাওয়া করতে করতে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে অনেক দূরে চলে গিয়েছিলেন। মহানবী (সা.) যখনই খালিদ বিন ওয়ালীদ এবং কুরাইশের অশ্বারোহীদের দেখেন তখন তাৎক্ষণিকভাবে এক দুঃসাহসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তখনও তাঁর (সা.) প্রতি অশ্বারোহীদের দৃষ্টি পড়ে নি , সে কারণে নিজেকে তিনি খুব সহজেই নিরাপদ আশ্রয় নিতে যেতে পারতেন; কিন্তু এরূপ করলে ইসলামী সৈন্যবাহিনীর ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি হওয়ার সমূহ আশংকা ছিল। এজন্য তিনি (সা.) যে সিদ্ধান্ত নেন তা হলো, পলায়নের পথ অবলম্বন করার পরিবর্তে উচ্চৈঃস্বরে তকবীর-ধ্বনি দেন যেন ইসলামী সেনাবাহিনী তা শুনে পেছনে দেখে। যখন ইসলামী সেনাবাহিনী যুদ্ধক্ষেত্রে অনেকটা সামনের দিকে ছিল, তাদের পূর্বে কুরাইশ অশ্বারোহীদের পর্যন্ত তাঁর (সা.) আওয়াজ পৌঁছে যাওয়াটাও অবধারিত ছিল। পরীক্ষার এই কঠিন মুহূর্তে মহানবী (সা.)-এর অতুলনীয় সাহসিকতা ও বীরত্ব প্রকাশিত হয়; বিস্ময়কর ও তুলনাহীন সাহসিকতা স্পষ্ট হয়। কেননা তিনি (সা.) নিজের প্রাণকে ক্ষতির মুখে ঠেলে দিয়ে সাহাবীদের প্রাণ রক্ষার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। তিনি উচ্চৈঃস্বরে সাহাবীদেরকে ডাকেন, হে আল্লাহ্‌র বান্দারা! এদিকে এসো! তাঁর (সা.) কণ্ঠস্বর পুরো রণক্ষেত্রে প্রতিধ্বনিত হয়েছিল। সাহাবীরাও পরিস্থিতির স্পর্শকাতরতা অনুধাবন করেছিলেন। যেহেতু তারা যথেষ্ট দূরে অবস্থান করছিলেন সে কারণে কুরাইশ অশ্বারোহী দলের একটি অংশ মহানবী (সা.)-এর ওপর আক্রমণ করে বসে আর অন্য অশ্বারোহীরা দ্রুততার সাথে মুসলমানদের ঘিরে ফেলতে শুরু করে।

(গাযওয়াহ ওয়াস সারায়া, পৃ: ১৮৩-১৮৪)

মহানবী (সা.)-এর আহত অবস্থাতেও চেতনা ঠিক রাখা এবং সাহাবীদের দিকনির্দেশনা প্রদান, তাদের সাহস জোগানোর উল্লেখও পাওয়া যায়। উতবা বিন আবী ওয়াক্কাস, যে হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রা.)-র ভাই ছিল, সে মহানবী (সা.)-এর ওপর একটি পাথর সজোরে নিক্ষেপ করে যা তাঁর মুখমণ্ডলে আঘাত করে। তাঁর (সা.) সামনের সারির নীচের পাটির দুটি দাঁত এবং ছেদন দাঁতের মধ্যবর্তী দাঁতও ভেঙ্গে যায়। একইসাথে এর কারণে নীচের ঠোঁট ফেটে যায়। বুখারী শরীফের ভাষ্যকার আল্লামা হাজার আসকালানী বর্ণনা করেন, দাঁতের একটি অংশ ভেঙ্গে গিয়েছিল, গোড়া থেকে উপড়ে যায় নি।

(ফতহুল বারি, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৪৬৪)

যাহোক, মহানবী (সা.) উতবা বিন আবী ওয়াক্কাসের বিরুদ্ধে এই দোয়া করেন, اَللّٰهُمَّ لَا يَحُوْلُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ حَتّٰى يَمُوْتَ كَافِرًا (আল্লাহুম্মা লা ইয়াহুলু আলাইহিল হাওলু হাত্তা ইয়ামুতা কাফিরান)। অর্থাৎ, হে আল্লাহ! এক বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই তাকে কাফির অবস্থায় মৃত্যু দাও। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর এই দোয়াটি গ্রহণ করেন আর সেদিনই হাতেব বিন আবি বালতা (রা.) তাকে হত্যা করেন। হযরত হাতেব (রা.) বলেন, যখন আমি উতবা বিন আবী ওয়াক্কাসের এই নির্লজ্জ ধৃষ্টতা দেখি তখন আমি তৎক্ষণাৎ মহানবী (সা.)-কে জিজ্ঞেস করি, উতবা কোথায় গেছে? তিনি (সা.) যেদিকে সে গিয়েছিল সেদিকে ইশারা করেন। আমি তৎক্ষণাৎ তার পিছু নিই। পরিশেষে তাকে একটি স্থানে ধরে ফেলতে সক্ষম হই। আমি তার ওপর তরবারি দিয়ে আক্রমণ করি যার ফলে তার মস্তক কেটে দূরে গিয়ে পড়ে। আমি এগিয়ে গিয়ে তার তরবারি ও ঘোড়াটি জব্দ করি এবং সেগুলো নিয়ে মহানবী (সা.)-এর সকাশে উপস্থিত হই। তিনি (সা.) এই সংবাদ শুনে দুইবার বলেন, রাযিয়াল্লাহু আনকা, রাযিয়াল্লাহু আনকা। অর্থাৎ আল্লাহ্ তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হোন, আল্লাহ্ তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হোন। (সীরাতুল হালবিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩১৭)

উহুদের যুদ্ধের সময় হযরত উম্মে আম্মারা (রা.) অর্থাৎ নুসায়বা (রা.) তার স্বামী হযরত যায়েদ বিন আসেম (রা.) এবং উভয় পুত্র খুবায়েব (রা.) ও আব্দুল্লাহ্ (রা.)- সবাই যুদ্ধের জন্য গিয়েছিলেন। পূর্বেও আমি এর উল্লেখ করেছি। মহানবী (সা.) তাদেরকে বলেন, আল্লাহ্ তোমাদের পরিবারের প্রতি রহমত (কল্যাণ) অবতীর্ণ করুন। একটি রেওয়ায়েতে এসেছে, আল্লাহ্ তোমাদের পরিবারকে আশিসমণ্ডিত করুন। তখন হযরত উম্মে আম্মারা (রা.) তাঁর নিকট নিবেদন করেন, আল্লাহ্‌র কাছে আমাদের জন্য দোয়া করুন- আমরা যেন জান্নাতে আপনার সাথি হই। তিনি (সা.) দোয়া করে বলেন, হে আল্লাহ্! তাদেরকে জান্নাতে আমার বন্ধু ও সাথি বানিয়ে দাও। সে সময় হযরত উম্মে আম্মারা (রা.) বলেন, পৃথিবীতে আমার সাথে কী ঘটবে সে ব্যাপারে আমার আর ভ্রুক্ষেপ নেই।

(সীরাতুল হালবিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩১৪)

এই হলো সেসব নিষ্ঠাবান মহিলা সাহাবীর সাহস এবং মহানবী (সা.)-এর প্রতি ঐকান্তিক ভালোবাসা এবং বিশ্বস্ততার দৃষ্টান্ত, আর এটিরও (প্রমাণ) যে, আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন ও তাঁর ধর্মের জন্য ত্যাগ স্বীকার করার বিপরীতে (তাদের কাছে) পৃথিবী ছিল তুচ্ছ। বস্তুবাদী নারীরা জাগতিক মোহ রাখে, কিন্তু তারা ছিলেন ধর্মের জন্য ত্যাগী নারী।

বর্ণনার এই ধারা আগামীতেও অব্যাহত থাকবে, ইনশাআল্লাহ্।

নামাযের পর আমি কয়েকজন প্রয়াত ব্যক্তির জানাযার নামায পড়াবো, তাদের স্মৃতিচারণও করছি।

প্রথম স্মৃতিচারণ হচ্ছে মোকাররম গোসসান খালিদ আন-নকীব সাহেবের যিনি সিরিয়ার অধিবাসী ছিলেন। সম্প্রতি তিনি ৭৮ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেছেন, ***ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন***। মরহুম মূসী ছিলেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারে স্ত্রী ছাড়াও এক পুত্র ও একজন কন্যা সন্ত ান রেখে গেছেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-র যুগে তিনি স্বয়ং বয়আতগ্রহণ করেছিলেন। এরপর তার তবলীগে তার পুত্র বয়আত করেছিলেন। তার স্ত্রী ও কন্যা এখনো বয়আত করেন নি।

মরহুমের পুত্র হুসামুন নকীব সাহেব লিখছেন, আমার পিতা আমার বন্ধু এবং আমার সঙ্গী ছিলেন। তিনিই আমাকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করার পথ দেখিয়েছেন। নব্বইয়ের দশকে আমার পিতা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-র অনুষ্ঠান 'লিকা মাআল আরব'-এর মাধ্যমে জামা'তের সাথে পরিচিত হন। এর পূর্বে আমার পিতার ধর্মের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি এতটুকু ছিল যে, ধর্ম কেবল উত্তম ব্যবহার করার নামান্তর। কিন্তু যখন তিনি 'লিকা মাআল আরব' অনুষ্ঠান দেখেন তখন তিনি বলেন, যদি কোথাও ধর্মের কোনো পুণ্যবান আলেম থেকে থাকেন তাহলে তিনি হচ্ছেন এই ব্যক্তি, অর্থাৎ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)। যদি কোথাও সঠিক ইসলাম ধর্ম থেকে থাকে তাহলে তা এটি যা এই লোকেরা বলছেন। তখন আমার পিতার বয়স প্রায় পঞ্চাশবছর ছিল। তখন তিনি নামায পড়া শিখেছেন, কেননা ইতঃপূর্বে তিনি কখনো নামায পড়েন নি। এরপর নামাযের ওপর তিনি এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত হন যে, আমার মনে পড়ে না তিনি কখনো তাহাজ্জুদ নামাযও পরিত্যাগ করেছেন। তিনি বলেন, আমার পিতা ২০০৩ সালে বয়আত গ্রহণ করেছিলেন। এর একমাস পর তিনি আমাকেও বুঝাতে সক্ষম হন। এটি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-র জীবনের শেষ সময়ের কথা।

এরপর লিখেন, আব্দুল হাই ভাট্টি সাহেব মুরব্বী সিলসিলাহ্‌র মাধ্যমে যখন আমার পিতা ওসীয়্যতের ব্যবস্থাপনার বিষয়ে অবগত হন, তাৎক্ষণিকভাবে নেযামে ওসীয়্যতে অন্তর্ভুক্ত হন। তখন তাকে বলা হয়েছিল, প্রথমে আল-ওসীয়্যত বইটি পড়ে নিন। তিনি উত্তরে বলেন, আমি বইটি অবশ্যই পড়ব আর বুঝারও চেষ্টা করব, কিন্তু এর ফলে এই ব্যবস্থাপনার প্রতি আমার ভালোবাসা ও এর সাথে সম্পৃক্ত হবার আগ্রহে কোনো ঘাটতি আসবে না। বরং এর অধ্যয়ন, এর প্রতি বিশ্বাস আরো বৃদ্ধি করবে; এর সত্য হবার ব্যাপারে বিশ্বাস তো আমার পূর্ব থেকেই আছে। জামা'তের সাথে যখন আমার পিতা পরিচিত হন তখন থেকেই জামা'তের বইপুস্তকের

যা কিছু পেতেন নিয়মিত তা অধ্যয়ন করার চেষ্টা করতেন। এরপর সেটি বুঝে কম্পিউটারে নিজের পছন্দ অনুযায়ী নোট তৈরি করতেন। আমাকে অধিকাংশ সময় বলতেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে এতটা দীর্ঘজীবী করুন যেন আমি মসীহ্ মওউদ (আ.) ও তাঁর খলীফাদের সকল বইপুস্ত ক পড়ে শেষ করতে পারি; যেন আমি বিগত বছরগুলোতে যা হারিয়েছি তা পূর্ণ করতে পারি। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-র তফসীরে কবীরের প্রতি মরহুমের গভীর ভালোবাসা ছিল এবং তিনি অসংখ্যবার এটি পাঠ করেছেন। তার পুত্র বলেন, আমার যখনই কোনো বিষয়ে সাহায্য দরকার হতো, আমার পিতা সে বিষয়টি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.), হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) ও তাঁর খলীফাদের পুস্তকের আলোকে সবিস্তারে ব্যাখ্যাসহ আমায় বের করে দিতেন। মরহুম জুমআর খুতবার অনুবাদ পরিমার্জনের কাজও করতেন; আমার যে লাইভ খুতবা যায়- সে খুতবার কথা বলছি। একইভাবে আরবী ডেস্কের পক্ষ থেকে পরিমার্জ নের কাজের জন্য তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতেন।

তিনি বলেন, আমি কখনো বলতাম যে, বিশ্রাম নিন। তিনি উত্তরে বলতেন, আমি তো জামা'তের কাজের মাঝেই আরাম খুঁজে পাই। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এবং তাঁর খলীফাদের পুস্তকসমূহের অনুবাদ পরিমার্জনেরসময় প্রায়ই তার চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে যেত। বয়আতের সময় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একজন সাহাবীর ঘটনা শোনান যে, তিনি বয়আত করে নিজের গ্রামে যান এবং প্রতিটি বাড়ির দরজায় কড়া নাড়েন আর সবার কাছে মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আগমনের বার্তা পেঁ ছান। এরপর আমার শ্রদ্ধেয় পিতারও একই রীতি ছিল, যার সাথেই তার সাক্ষাৎ হতো, সে সাক্ষাৎ পাঁচ মিনিটের জন্য হলেও তাকে মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আগমনের বিষয়ে অবশ্যই বলে দিতেন। তিনি বলতেন, আমার কাজ হলো মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আগমনের সুসংবাদ পৌঁছানো।কেউ যদি বু ঝে তো ভালো, অন্যথায় আমি বীজ ঠিকই ছড়িয়ে দিয়েছি। সেটি উদ্গত করা হিদায়াতদাতা খোদা তা'লার কাজ।

সিরিয়ার ওয়াসীম মোহাম্মদ সাহেব তার ব্যাপারে লিখেন, জুমুআর পর মরহুম মনোমুগ্ধকর দরস দিতেন। ২০১৯-২০২২ সাল পর্যন্ত তিনি সেক্রেটারি এশায়াত হিসেবে সেবা প্রদান করেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পুস্তক পাঠের প্রতি মরহুমের গভীর আগ্রহ ছিল, বরং তিনি নিজেই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পুস্তকসমূহের কঠিন শব্দাবলির অর্থ ও ব্যাখ্যা লিখতেন।হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-র তফসীরে কবীরের অর্থ অধ্যয়ন করে তা থেকে 'কাসাসুল আম্বিয়া' অংশটুকু পৃথক করে সংক্ষিপ্তাকারে একটি পুস্তকরূপে উপস্থাপন করেন যা জামা'তের (আরবী) ওয়েবসাইটে বিদ্যমান আর জামা'তের সদস্যরা, বিশেষত বাচ্চারা এ থেকে অনেক উপকৃত হয়।

আত-তাকওয়া ম্যাগাজিনের সম্পাদক ওবাদা বারবুশ সাহেব বলেন, মরহুম অগণিত গুণের অধিকারী ছিলেন। খিলাফতের সাথে অকৃত্রিম ভালোবাসা ও বিশ্বস্ততার সম্পর্ক ছিল। বয়োবৃদ্ধ এবং চাকরীজীবি হওয়া সত্ত্বেও মরহুম সেচ্ছাসেবার ভিত্তিতে আত-তাকওয়া ম্যাগাজিনে সেবা প্রদান করতেন আর যখনই কোনো দায়িত্ব প্রদান করা হতো সেটিকে পালন করা নিজের সৌভাগ্য জ্ঞান করতেন। মরহুম সাত বছর পর্যন্ত আত -তাকওয়া ম্যাগাজিনের পুরনো সংখ্যা টাইপ করা এবং সেগুলোকে কম্পিউটারাইজড করতে আমাদের অনেক সাহায্য করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের সাথে ক্ষমাসুলভ ও অনুগ্রহপূর্ণ আচরণ করুন, মর্যাদা উন্নীত করুন; তার সন্তানদের স্বপক্ষে তার দোয়া কবুল করুন।

দ্বিতীয় স্মৃতিচারণ স্নেহের নওশাবা মোবারক সাহেবার যিনি মুরব্বী সিলসিলাহ্ জালীস আহমদ সাহেব স্ত্রী ছিলেন, তিনি এখানে (অর্থাৎ লন্ডনে) আর্কাইভ ও আল-হাকাম এ কাজ করছেন। সম্প্রতি পাকিস্তান থেকে ফেরত আসার পথে রাবওয়া এবং লাহোরের মাঝামাঝি একটি দুর্ঘটনার শিকার হয়ে মৃত্যু বরণ করেন, ***ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন***। তার উত্তরসূরি হিসেবে স্বামী, পিতামাতা ছাড়াও চার ভাই ও দু ই বোন রয়েছে। মরহুমার ওসীয়্যতের কার্যক্রমচলমান ছিল, হঠাৎ মৃত্যু বরণ করেন। যাহোক, সে কার্যক্রম চলছে। তার ওসীয়্যত হয়ে যাবে, ইনশাআল্লাহ্। এ দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি মূসীয়া ছিলেন।

তার স্বামী স্নে হের জালীস আহমদ লিখেন, খাকসার আল্লাহ্ তা'লার দরবারে অশেষ কৃতজ্ঞ, কেননা আল্লাহ্ তা'লা অধমকে এমন একজন স্ত্রী দান করেছিলেন যিনি অসংখ্য গুণের অধিকারীছিলেন। তিনি ওয়াকেফে যিন্দেগীকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সর্বদা ধর্মকে প্রাধান্য দিয়েছেন। কখনওআমার কাছে কোনো চাহিদা উত্থাপন করেন নি। সর্বদা অন্যের আনন্দের কারণ হতেন। জামা'তের বিভিন্ন পদে সেবা প্রদান করেছেন। সহকারী সেক্রেটারি মাল এবং সহকারী সেক্রেটারি ওসীয়্যত হিসেবে সহযোগিতা করেছেন। কঠোর পরিশ্রম এবং একাগ্রতার সাথে কাজ করতেন। তিনি বলেন, আমার কাজে আমাকে সাহায্য করতেন। আমার জামা'তী কাজে কখনো আপত্তি করেন নি। কখনো চাহিদা উত্থাপন করেন নি। সত্যিকার অর্থেই তিনি ওয়াকফ্-এর চেতনা যথার্থভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। প্রত্যেক রমযানে তিনি অন্তত পক্ষে তিনবার আবার কখনো কখনো চারবার পবিত্র কুরআন অনুবাদসহ খতম করতেন। খিলাফতের প্র তি গভীর সম্মান এবং ভালোবাসা রাখতেন।

তার মা জেবুন নেসা সাহেবা বলেন, মরহুমা আমার সবচেয়ে ছোট মেয়ে ছিল। মেয়েটি সবাইকে অনেক ভালোবাসতো এবং মিশুক ছিল। আমাদের সবাইকে অনেক ভালোবাসতো, আমার সন্তানদের মাঝে (সে) সবচেয়ে বুদ্ধিমতী ছিল। নামায-রোযায় অভ্যস্ত ছিল, জামা'তের সেবায় সর্বাগ্রে থাকত। হাফেযাবাদ গ্রামের পীরকোট সানীতে আমি লাজনার প্রেসিডেন্ট ছিলাম, সেখানে আমাকে কাজে অনেক সাহায্য করত। রাবওয়াতে এসেও জামা'তী কাজে সাহায্য করত।

(মরহুমার) ভাই কামরান শাহেদ বলেন, মরহুমা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী বাফান্দার মিয়া নিজামুদ্দিন সাহেবের প্রপৌত্রি ছিল। ছোট-বড়ো সবার সাথে আন্তরিকতাপূ র্ণ আচরণ করত আর সবাইকে ভালোবাসত। আর খিলাফতের সাথে (তার) সুগভীর আন্তরিকতা ও বিশ্ব স্ততার সম্পর্ক ছিল। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমার পদমর্যাদা উন্নীত করুন, সবাইকে ধৈর্য ও দৃ ঢ় মনোবল দান করুন। তার পিতামাতা ও (তার) স্বামী এবং ভাইবোনদেরও (ধৈর্য ও দৃঢ় মনোবল দান করুন)।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ হলো রাবওয়া নিবাসী মরহুম আব্দুল হামীদ খান সাহেবের স্ত্রী মেকাররমা রাজিয়া সুলতানা সাহেবার, যিনি আইভরি কোস্টের আমীর ও মিশনারী ইনচার্জ আব্দুল কাইয়্যুম পাশা সাহেবের মা ছিলেন। সম্প্রতি বিরানব্বই বছর বয়সে তিনি মৃত্যু বরণ করেন, ***ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন*** । আল্লাহ্ তা'লার কৃ পায় তিনি ওষীয়্যত করেছিলেন।

কাইয়্যুম পাশা সাহেব লিখেছেন, তিনি উকিলে আ'লা তাহরীকে জাদীদ মরহুম চৌধুরী হামীদুল্লাহ্ সাহেবের বড়ো বোন ছিলেন। (মরহুমার) পিতামাতা ১৯২৯ সালে আহমদীয়াত গ্রহণ করেছিলেন। শুরু থেকেই রূহানী খাযায়েন পাঠের প্রতি গভীর আগ্রহী ছিলেন আর এভাবে তিনি তার জীবদ্দশায় বহুবার পুরো রূহানী খাযায়েন পাঠের পাশাপাশি তফসীরে কবীর ও অন্যান্য জামা'তী সাহিত্য অধ্যয়ন করেছেন। তার নিজের পাড়া দারুল উলুম ওয়াসতীর লাজনার প্রেসিডেন্ট এবং সেক্রেটারি মাল হিসেবে সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। (কাইয়্যুম পাশা সাহেব) বলেন, অধমের কতিপয় আত্মীয়স্বজন (আমার) মা-কে বলতেন, আপনার স্বামীও মৃত্যু বরণ করেছেন, একটিই ছেলে; তাকে জামেয়াতে মুরব্বী না বানিয়ে- যে কেবল মাসিক সামান্য ভাতা পাবে- অন্য কোনো কর্ম ক্ষেত্রে প্রেরণ করুন। (আমার) মা উত্তর দেন, সে জামেয়াতেই ভর্তি হবে! রিযিকের বিষয়টা হলো, খোদা তা'লা রিযিকদাতা (আর) তঁ ার ওপর আমি আস্থা রাখি। (কাইয়্যুম পাশা সাহেব) বলেন,যখনই অবসর ভাতা বা অন্য কোনো মাধ্যমে কোনো টাকা পেতেন তৎক্ষণাৎ সেক্রেটারি মাল সাহেবের বাসায় গিয়ে নিজের ওসীয়্যতের চাঁদা পরিশোধ করতেন; সেক্রেটারি মাল সাহেবকে চাঁদা নেওয়ার জন্য কখনও আমাদের বাড়িতে আসতে হয় নি। মৃত্যুর সময় তিনি এক পুত্র ও দুই কন্যা রেখে গেছেন। যেমনটি আমি বলেছি, মরহুমার পুত্র অব্দুল কাইয়্যুম পাশা সাহেব আইভরি কোস্টের মিশনারী ইনচার্জ, কর্ম ক্ষেত্রে থাকার কারণে (তার) মায়ের জানাযাতে অংশগ্রহণ করতে পারেন নি। আল্লাহ্ তা'লা তাদের সবাইকে ধৈর্য ও দৃঢ় মনোবল দান করুন এবং তার মায়ের পদমর্যাদা উন্নীত করুন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ হলো লাহোর নিবাসী ডাক্তার মুহাম্মদ সেলীম সাহেবের স্ত্রী মোকাররমা বুশরা বেগম সাহেবার, তিনি সিয়েরা লিওনের মুবাল্লিগ মুহাম্মদ নাঈম আযহার সাহেবের মা ছিলেন। সম্প্রতি আটাত্তর বছর বয়সে তিনি মৃত্যু বরণ করেন, ***ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন***। আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে মূ সীয়া ছিলেন। তিনি তার শোকসন্ত প্ত পরিবারে দুই পুত্র ও পাঁচ কন্যা রেখে গেছেন। তার ছেলে নাঈম আযহার সাহেব কর্মক্ষেত্রে থাকার কারণে (তার) মায়ের জানাযা ও দাফন-কাফনে অংশগ্রহণ করতে পারেন নি।। নাঈম আযহার সাহেব লিখেছেন, (আমার) মা জন্মগত আহমদী ছিলেন না, কিন্তু আহমদী আত্মীয়স্বজন ছিল আর তার মাঝে সত্য অন্বেষণের আকাঙ্ক্ষা ছিল। আল্লাহ্র কাছে অনেক দোয়া করার ফলে তার হৃদয় আশ্বস্ত হয় এবং অবশেষে ১৯৬৪ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-র হাতে বয়আত করেন আর সারা জীবন এই সম্পর্ক অতি বিশ্বস্ততার সাথে রক্ষা করেছেন। আহমদীয়াতের জন্য সকল প্রকার কুরবানী করতে সদা প্রস্তুত থাকতেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় অনেক

দোয়াকারী, পাঁচ ওয়াক্তের নামায ছাড়াও নিয়মিত তাহাজ্জুদ আদায়কারী, সাহসী এবং দৃঢ়চিত্তের অধিকারিনী মহিলা ছিলেন। নীরবে কষ্ট সহ্য করতেন কিন্তু মুখে টুঁ শব্দটুকুও করতেন না। যুগ-খলীফার প্রত্যেক আর্থিক কুরবানীর তাহরীকে বেশি বেশি অংশগ্রহণ করতেন। জামা'তের চাঁদা নিয়মিত প্রথমদিকে পরিশোধ করে দিতেন। পরবর্তীতে অন্যান্য চাঁদায়ও অংশগ্রহণ করতেন। প্রত্যেক অভাবীকে সাধ্যানুযায়ী সাহায্য করতেন। কাউকে কখনো খালি হাতেফেরাতেন না। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমার প্রতি ক্ষমা ও দয়াসু লভ আচরণ করুন, তার সন্তানদের স্বপক্ষে তার সকলদোয়া কবুল করুন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ নরওয়ের মোকাররম রশীদ আহমদ চৌধুরী সাহেবের। তিনি চৌধুরী গোলাম হোসেন সাহেবের সুপুত্র ছিলেন; সম্প্রতি ৮২ বছর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন, ***ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন***। অত্যন্ত দৃঢ়তা, সাহস ও ধৈর্যের সাথে নিজের অসুস্থতার মোকাবিলা করেন। বেশ কিছুকাল থেকে তিনি অসুস্থ ছিলেন। তার পিতা চৌধুরী গোলাম হোসেন সাহেব ওভারসিয়ার ছিলেন; ১৯২৬ সালে স্বয়ং কাদিয়ান গিয়ে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-র হাতে বয়আত করার সৌভাগ্য লাভ করেন। পরবর্তীতে তিনি জীবন উৎসর্গ করেন। দারুল কাষা কাদিয়ান এবং রাবওয়াতে কাজী হিসেবে সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। কেন্দ্রের স্থাপনাগুলোর নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে সেবাদানের সু যোগ পেয়েছেন। চৌধুরী রশীদ সাহেবেরও তার পিতার সাথে রাবওয়ার প্রাথমিক দিনগুলোতে সেবাদানের সৌভাগ্য হয়েছে। খিলাফতে সানীয়া এবং খিলাফতে সালেসার যুগে কাসরে খিলাফত এবং অন্যান্য পাকা স্থাপনায় ইলেকট্রিশিয়ান হিসেবে তিনি অনেক কাজ করেছেন। ১৯৭০ সালে তিনি নরওয়ে চলে যান। সেখানে জামা'তের সেবায় সর্বদা সম্মুখ সারিতে ছিলেন। তিনি নিঃস্বার্থ সেবাদান করেছেন। নরওয়ের প্রথম কেন্দ্রেও তার নিঃস্বার্থ সেবা রয়েছে। সেখানে কাজ করে তিনি জামা'তের অনেক অর্থ সাশ্রয় করেছেন। দীর্ঘদিন তিনি নরওয়ের সেক্রেটারি উমুরে আম্মা হিসেবে সেবাদানের সৌভাগ্য পেয়েছেন।

তার পুত্র জনাব মোজাফফর চৌধুরী এবং জনাব মুনাওয়ার চৌধুরী লিখেছেন: (আমাদের পিতার) খিলাফতের সাথে গভীর এবং অগাধ ভালোবাসা ছিল। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-র নরওয়ে সফরের সকল দায়িত্ব তার স্কন্ধে অর্পিত হতো। হুযূর (রাহে.) তাকে তাঁর নরওয়ের গাইড বলে সম্বোধন করতেন। জুমুআর খুতবাতেও তিনি (রাহে.) তার সেবার কথা উল্লেখ করেন। খিলাফতের আসনে সমাসীন হওয়ার পর আমার সাথেও অকৃত্রিম বিশ্বস্ততার সম্পর্ক ছিল। পূর্বেই তিনি আমার পরিচিত ছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে সেই সম্পর্ক আরো গভীর হয়। তার পিতাও আমার পিতার খুব কাছের মানুষ ছিলেন। আশৈশব চৌধুরী গোলাম হোসেন সাহেবকে আমরা দেখেছি। সদা হাস্যোজ্জ্বল এবং খুব সুন্দর স্বভাবের অধিকারী ছিলেন। চৌধুরী রশীদ সাহেবের আচার-আচরণ তার পিতার সাথে খুবই সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমাসু লভ আচরণ করুন। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সৃষ্টির সেবায় সর্বদা প্রস্তুত থাকতেন। তিনি তার শোকসন্তপ্ত পরিবারে স্ত্রী ছাড়া দুই পুত্র এবং চারজন কন্যা সন্তান রেখে গিয়েছেন। তিনি অস্ট্রেলিয়ার আমীর ও মিশনারী ইনচার্জ মোকাররম এনামুল্লাহ্ কওসার সাহেবের ভগ্নিপতিছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা (তাদের) সবাইকে ধৈর্য ও দৃঢ় মনোবল দান করুন। আমি পূর্বেও বলেছি, নামাযের পর আমি তাদের গায়েবানা জানাযা পড়াবো, (ইনশাআল্লাহ্)।

****

১২৯ তম বাৎসরিক জলসা কাদিয়ান

সৈয়্যেদনা হযরত আমীরুল মু'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ) ২০২২ সালের জলসা সালানা কাদিয়ানের জন্য অনুমতি প্রদান করেছেন। জলসার দিনগুলি হল ২৭, ২৮ ও ২৯ শে ডিসেম্বর ২০২৪ (শুক্র, শনি ও রবিবার)। জামাতের সদস্যগণ এখন থেকেই দোয়ার সাথে এই মোবারক জলসায় অংশ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি আরম্ভ করে দিন। আল্লাহ্তা'লা আমাদের সকলকে এই ঐশী জলসা থেকে কল্যাণ মণ্ডিত হওয়ার তৌফিক দান করুন। এই জলসা সালানার সার্বিক সফলতার ও বরকত মণ্ডিত হওয়ার জন্য এবং হেদায়েতের কারণ হওয়ার জন্য দোয়ায় রত থাকুন। জাযাকুমুল্লাহ্ ওয়া আহ্সানুল জাযা।

(নাজির ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাজিয়া, কাদিয়ান)

সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া কাদিয়ান- এ খিদমতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞপ্তি

২য় শ্রেণীর কর্মী নিয়োগের জন্য শর্তাবলীঃ

(১)প্রত্যাশীর বয়স ১৮ উর্দ্ধ এবং অনুর্দ্ধ ২৫ হওয়া বাঞ্ছনীয়। (২) শিক্ষাগত যোগ্যতা হিসেবে উচ্চ-মাধ্যমিকে কমপক্ষে৪৫% নম্বর নিয়ে উত্তীর্ণ হতে হবে।(৩) উর্দু/ ইংরেজি কমপোজিং এ পারদর্শী হতে হবে। টাইপিং এর গতি মিনিটে ৪৫ শব্দ হওয়া বাঞ্ছনীয়। (৪) এই ঘোষণার ২ মাসের মধ্যে যে আবেদনগুলি আসবে সেগুলিই গণ্য করা হবে।

(৫) নিয়োগ কমিশনের পরীক্ষার পাঠ্যক্রম নিম্নরূপ: (প্রতিটি বিভাগে উত্তীর্ণ হওয়া আবশ্যক।

১ম ভাগ: (৩০ নম্বর) কুআন করীম নাজেরা (দেখাপড়া) এবং ১ম পারার অনুবাদ। * চালিশ জোয়াহের পারে, আরকানে ইসলাম, নামায (সম্পূর্ণ) অনুবাদ।

২য় ভাগ (২০ নম্বর) কিশতিয়ে নূহ, বারকাতুদ দোয়া, দ্বিনী মালুমাত* জামাত আহমদীয়ার আকিদাসমূহ সম্পর্কে প্রবন্ধ* দুররে সামীন থেকে নযম (শানে ইসলাম)।

৩য় ভাগ: (২০ নম্বর) উচ্চমাধিক স্তরের ইংরেজি।

৪র্থ ভাগ (২০ নম্বর) মাধ্যমিক স্তরের গণিত (অফিসের ইম্প্রেস্ট সম্পর্কি প্রশ্ন)

৫ম ভাগ (১০ নম্বর) সাধারণ জ্ঞান।

৬) লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে তবেই ইন্টারভিউ নেওয়া হবে। (৭) লিখিত পরীক্ষা, কম্পিউটার টেস্ট এবং ইন্টারভিউয়ে উত্তীর্ণ হলে প্রত্যাশীকে নূর হাসপাতালে মেডিক্যাল ফিটনেস ও স্বাস্থ্য পরীক্ষায় নিজেকে সুস্থ ও সবল প্রমাণ করতে হবে। (৮) প্রত্যাশীকে কাদিয়ান যাতায়াতের খরচ নিজে বহন করতে হবে। (৯) প্রত্যাশী প্রার্থী নির্বাচিত হলে কাদিয়ানে থাকার ব্যবস্থা নিজেকেই করতে হবে। পরে থাকার বিষয়ে কোন প্রকারের আবেদন গ্রাহ্য করা হবে না।

(নোট: লিখিত পরীক্ষা এবং ইন্টারভিউ -এর দিনক্ষণ জানানো হবে।)

প্রত্যেক সেই বিষয় থেকে বিরত থাক যা ধর্মের মাঝে অধর্ম ও নতুন ধর্মাচারের পথ খুলে দেয়

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) বলেন:

'হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর জামাতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য প্রত্যেক সেই বিষয় থেকে বিরত থাকতে হবে যা ধর্মের মাঝে অধর্ম ও নতুন ধর্মাচারের পথ খুলে দেয়। .... অনেক অপছন্দনীয় কাজ বিবাহ অনুষ্ঠানাদিতে করা হয়। যেগুলি অন্যরাও অনুকরণ করতে শুরু করে। এভাবে এই সব অধর্ম তত্ব সমাজের গভীরে শেকড় ছড়িয়ে দেয়। পরিণামে ধর্মে ও জামাতীয় ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়।

(সূত্র: মশআলে রাহ, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৩)

অঙ্গ সংগঠনগুলির বাৎসরিক ইজতেমা, ২০২৪

সৈয়্যদানা হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর অনুমোদনক্রমে এ বছর মসজিলস খুদ্দামুল আহমদীয়া ও আতফালুল আহমদীয়া, মজলিস আনসারুল্লাহ্ এবং লাজনা ইমাইল্লাহ্-এর বাৎসরিক ইজতেমা (২০২৪) ২৫,২৬ ও ২৭ শে অক্টোবর তারিখে (শুক্র, শনি ও রবিবার) অনুষ্ঠিত হবে। জামাতের সমস্ত সদস্যদের প্রতি অনুরোধ, আপনারা সেই অনুসারে দোয়ার সাথে উক্ত ইজতেমায় অংশগ্রহণ করার যথাসাধ্য চেষ্টা করুন।

(সদর মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়া, ভারত)

যুগ ইমামের বাণী

স্মরণ রেখো! কাজ তারাই করতে পারে, অর্থাৎ ধর্মের সেবা তারাই করতে পারে যাদের মধ্যে স্বর্গীয় জ্যোতি বিদ্যমান।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৩)

দোয়াপ্রার্থী: Jahanara Begum, Bhagbangola, (Murshidabad)

হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর জার্মানী সফর, ২০২৩ (সেপ্টেম্বর)

২৭ শে আগস্ট, ২০২৩, ইসলামাবাদ (যুক্তরাজ্য) থেকে যাত্রা

আজ জার্মানীর উদ্দেশ্যে যাত্রার দিন ছিল। এর পূর্বে হুযুর আনোয়ার (আই.) ২০১৯ সালের অক্টোবর মাসে জার্মান সফরে এসেছিলেন। পরে কোভিড মহামারির কারণে বিগত কয়েক বছরে জার্মানী সহ ইউরোপের কোন দেশের সফর করা সম্ভব হয় নি। চার বছর পর হুযুর আনোয়ার জার্মানীর সফরে রওনা হচ্ছিলেন।

কর্মসূচি মেনে হুযুর আনোয়ার সকাল ১০টা ৫ মিনিটে নিজের বিশ্রামকক্ষ থেকে বের হন। বাসভবনের উঠোনে হুযুর আনোয়ারকে বিদায় জানাতে জামাতের নারী ও পুরুষ সদস্যদের ভিড় জমে ছিল। হুযুর এসে দোয়া করেন। এরপর ইসলামাবাদের সীমা থেকে পাঁচটি গাড়ির কনভয় ব্রিটেনের বন্দর শহর ডোভার এর উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। লন্ডন ও তৎসংলগ্ন এলাকার মানুষ ফেরির মাধ্যমে এই বন্দর দিয়েই যাতায়াত করেন। ডোভার শহর থেকে এগারো মাইল পূর্বে ফল্কস্টোন এলাকায় সেই প্রসিদ্ধ চ্যানেল ট্যানেল অবস্থিত যা ব্রিটেন ও ফ্রানএসর উপকূলী এলাকাকে যুক্ত করেছে। এই সুড়ঙ্গের মাধ্যমে ছোট ও বড় গাড়ি ট্রেনে করে ফ্রান্সের উপকূলীয় শহর ক্যালাস পর্যন্ত পোঁছয়। আজকেও এই সুড়ঙ্গের মাধ্যমে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল।

ইসলামাবাদ (টিলফোর্ড) থেকে মাননীয় রফীক আহমদ হায়াত সাহেব (আমীর জামাত ইউকে), মাননীয় ডক্টর শাব্বীর আহমদ ভাট্টি সাহেব (নায়েব আমীর ইউকে), মাননীয় সদর মজলিস আনসারুল্লাহ্ ডক্টর এজাজুর রহমান সাহেব, মাননীয় আতাউল কুদ্দুস সাহেব রিজিওনাল আমীর, মাননীয় নাসের ইনাম সাহেব (প্রিন্সিপাল জামেয়া আহমদীয়া, ইউকে) এবং মাননীয় আব্দুল কুদ্দুস আরিফ সাহেব সদর মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়া ইউকে খুদ্দামদের নিরাপত্তারক্ষীদের সাথে নিয়ে হুযুর আনোয়ারকে বিদায় জানাতে চ্যানেল টানেল পর্যন্ত কনভয়ের সঙ্গে এসেছিলেন।

প্রায় এক ঘন্টা চল্লিশ মিনিট যাত্রার পর ১১:৪৫টায় চ্যানেল টানেলে পোঁছন। ইসলামাবাদ থেকে আসা সদস্যরা হুযুরকে বিদায় জানিয়ে সেখান থেকে ফেরত যান।

এরপর ইমিগ্রেশন ও অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতার পর কিছুক্ষণের জন্য হুযুর আনোয়ার স্পেশাল লাউঞ্জে যান।

প্রায় ১:০৫টায় কনভয়ের গাড়িগুলি ট্রেনে তোলা হয়। ট্রেন ১:২৫টায় ঘন্টায় ১৪০ কিমি গতিতে ফ্রান্সের বন্দর শহর কালাসের উদ্দেশ্যে রওনা হয়।

এই সুড়ঙ্গের দৈর্ঘ ৩১ মাইল, যার মধ্যে সমুদ্রের মধ্যেকার অংশ ২৪ মাইল। সুড়ঙ্গের গভীরতম অংশটি সমুদ্র তল থেকে ৭৫ মিটার বা ২৫০ ফুট নীচে অবস্থিত। সমুদ্রের তলদেশে নির্মিত এটি পৃথিবীর দীর্ঘতম সুড়ঙ্গ। প্রায় ৩৫ মিনিট যাত্রা শেষে ফ্রান্সের স্থানীয় সময় দুপুর ৩টায় কালাস শহরে পোঁছয়।

২৮ শে আগস্ট

মসজিদ মুবারক (ফ্লোরিস্টাড) এর উদ্বোধন

বেলা ৫:২৫ মিনিটে হুযুর আনোয়ার মসজিদ মুবারকে আসেন। স্থানীয় জামাতের সদস্যগণ হুযুরকে স্বাগত জানান। আজকের দিনটি তাদের জন্য ভীষণ আনন্দের। তারা নারাধ্বনি উচ্চকিত করছিল আর বালিকার দল আগমণী গীত গাইছিল।

স্থানীয় জমাতের সদর আনাস আহমদ খান সাহেব এবং আঞ্চলিক আমীর মুজাফফর আহমদ ভাট্টি সাহেব এবং ফ্লোরাস্টিড শহরের মুবাল্লিগ তাহসীন রাশিদ সাহেব হুযুর আনোয়ারকে স্বাগত জানান। শহরের মেয়র মি. হার্বার্ট উঙ্গের সাহেবও হুযুর আনোয়ারকে স্বাগত জানাতে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। একজন তিফল হুযুর আনোয়ারকে পুষ্পস্তবক উপস্থাপন করে।

এরপর হুযুর আনোয়ার মসজিদ বাইরে দেওয়ালে স্থাপিত নামফলক উন্মোচন করেন এবং দোয়া করেন। এরপর হুযুর আনোয়ার মসজিদের উপরের হলঘরে এসে জোহর ও আসরের নামায জমা করে পড়ান এবং এর মাধ্যমে মসজিদের উদ্বোধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

নামাযের পর হুযুর আনোয়ার কিছুক্ষণের জন্য মানুষের সঙ্গে সাক্ষাত করেন।

হুযুর আনোয়ার মসজিদ সম্পর্কে সদর জামাতের কাছে জানতে চান যে মসজিদের গম্বুজ নির্মাণের অনুমতি পাওয়া যায় নি আর মিনারও বেশি উঁচু বানানো হয় নি। সদর সাহেব বলেন, এখানকার এক স্থানীয় আইন অনুসারে প্রশাসনের পক্ষ থেকে গম্বুজ বানানোর অনুমতি পাওয়া যায় নি আর মিনারের উচ্চতাও রাখা হয়েছে ছাদের উচ্চতার সমান।

হুযুর আনোয়ার চার্চ সম্পর্কে বলেন, এখনকার চার্চের মিনারগুলি তো বেশ উঁচু হয়ে থাকে। হুযুর আনোয়ার জানতে চান যে মসজিদ সংলগ্ন এলাকায় কতজন সদস্য বা পরিবার থাকে দশ মিনিট পায়ে হাঁটা দূরত্বে কতগুলি পরিবার থাকে। হুযুর আনোয়ার বলেন, ছোট্ট একটি শহর, এখানকার মানুষ কোথায় কাজ করতে যায়? সদর সাহেব বলেন, বেশিরভাগ মানুষ ফ্রাঙ্কফোর্ট যায়।

হুযুর আনোয়ার শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় প্রার্থীদের বিষয়ে জানতে চান যে, বিগত কয়েক বছরে এখানে কতজন নতুন মানুষ এসেছেন, কতগুলি নতুন পরিবার এসেছে? এর উত্তরে যাহেদ রাশীদ সাহেব বলেন, ২০১৬ সালে তিনি নানকানা থেকে এসেছিলেন। হুযুর আনোয়ার বলেন, আপনার সাক্ষাত তো হয়েছিল। ভদ্রলোক বলেন, আমার পরিবারের বাকি সদস্যরা সম্প্রতি এখানে এসেছে, তাদের এখনও সাক্ষাত হয় নি।

অপর এক সদস্য মুনীর আহমদ সাহেব বলেন, তিনিও কয়েক বছর পূর্বে আহমদ নগর থেকে এসেছেন।

এরপর হুযুর আনোয়ার মসজিদের ছাদে আসেন। জার্মানীর আমীর সাহেব হুযুর আনোয়ারকে জানান, জার্মানীতে নির্মিত মসজিদগুলির মধ্যে এটি প্রথম মসজিদ যেখানে সৌরবিদ্যুতের মাধ্যমে বিদ্যুতের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রায় ৯০ শতাংশ বিদ্যুত সোলার প্যানেলের মাধ্যমে পাওয়া যাবে।

এরপর হুযুর আনোয়ার মসজিদের নীচের তলায় আসেন যেখানে মহিলারা তাঁর আগমণের অপেক্ষায় ছিল। বালিকাদের দল সমবেত কণ্ঠে নযম এবং দোয়া সংবলিত কবিতা উপস্থাপন করে। হুযুর আনোয়ার কচিকাচাদেরকে চকলেট উপহার দেন।

এরপর হুযুর আনোয়ার মসজিদের আঙিনায় বাদামের চারাবৃক্ষ রোপন করেন। অপরদিকে শহরের মেয়র সাহেব খুবানির চারা রোপন করেন।

এরপর হুযুর আনোয়ার মুরুব্বী সিলসিলা তাহসীন রশীদ সাহেবের বাসভবনে যান। তাঁর বাসভবনটি মসজিদ সংলগ্ন মিশন হাউসে।

মসজিদ মুবারক (ফ্লোরাস্টিট) এর উদ্বোধন উপলক্ষ্যে মসজিদের অনতিদূরে অবস্থিত 'আরালিয়া বালাসাল' ভবনে একটি অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বেলা ৬:০৫টায় রওনা হয়ে ৬:১৮টায় উক্ত ভবনে পোঁছে যান।

হুযুর আনোয়ারের আগমণের পূর্বে উক্ত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী অতিথিরা নিজেদের আসনে বসে ছিলেন। আজকের এই অনুষ্ঠানে ১১৪ জন অতিথি অংশগ্রহণ করেছিলেন যাদের মধ্যে ছিলেন প্রাদেশিক সাংসদ, দুটি শহরের মেয়র, স্থানীয় ও প্রাদেশিক রাজনীতিক, পুলিসকর্মী, উকিল এবং বিভিন্ন পেশার সঙ্গে যুক্ত মানুষ। ৬:২২টায় কুরআন করীমের তিলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। মাননীয় হাফিজ তাহির আহমদ সাহেব তিলাওয়াত করেন এবং মাননীয় ফরিদ সামী সাহেব তিলাওয়াতকৃত আয়াতের জার্মান অনুবাদ উপস্থাপন করেন। এরপর জার্মানীর আমীর আব্দুল্লাহ ওয়াগাস সাহেব জামাতের পরিচিতিমূলক বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি বলেন, 'ওয়াটারু =এর মাঝামাঝি অবস্থিত একটি সুন্দর শহর। শহরের জনসংখ্যা প্রায় দশ হাজার। এই শহরের রয়েছে দুই হাজার বছর পুরানো সমৃদ্ধ ইতিহাস। এখানে জামাতের সদস্য সংখ্যা ১৬০জন। মসজিদ নির্মিত হওয়ার পূর্বে আশপাশের জামাতগুলিতে এখানকার সদস্যরা নিজেদের অনুষ্ঠানসমূহে একত্রিত হত।

৮১১ বর্গমিটার মসজিদের প্লটটি ২০১৫সালের জানুয়ারী মাসে ক্রয় করা হয়। এর মধ্যে ৫০৬ বর্গমিটারের মধ্যে মসজিদটি গড়ে ওঠেছে। নামারে জন্য উপরের ও নীচের তলায় দুটি হলঘর নির্মাণ করা হয়েছে- একটি পুরুষদের, অপরটি মহিলাদের যাদের আয়তন ৭০ ও ৬৫বর্গমিটারের মাঝামাঝি। এছাড়া দৈনন্দিন প্রয়োজনের জন্য একটি মাল্টি পারপাজ হলঘর রয়েছে। একটি লাইব্রেরি, অফিস এবং রান্নাঘরও রয়েছে। মসজিদের সাথে একটি মুরুব্বী হাউসও নির্মাণ করা হয়েছে।

সব শেষে আমীর সাহেব শহর প্রশাসনের সেই সমস্ত ব্যক্তির প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন যাদের পক্ষ থেকে মসজিদ নির্মাণের জন্য বিভিন্ন সহযোগিতা পাওয়া গেছে।

এরপর শহরের মেয়র মি.হার্বার্ট উঙ্গের সাহেব বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি বলেন, আমি সর্ব প্রথম হুযুর আনোয়ার এর সমীপে সালাম নিবেদন করতে চাই এবং তাঁকে স্বাগত জানাতে চাই। এরপর আমি উপস্থিত শ্রোতাবর্গ ও জামাতের সদস্যদেরকে সালাম জানাই। তিনি বলেন, নিঃসন্দেহে মসজিদ নির্মাণে অনেক বেশি সময় ব্যয় হয়েছে কিন্তু এখন সেটি সুসম্পন্ন হয়েছে। যারা আমার মত মসজিদ স্থাপনের সমস্ত প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হয়েছে- যেমন মসজিদের পরিকল্পনা, অর্থায়ন, শহর প্রশাসনের পক্ষ থেকে অনুমতি লাভ এবং নির্মাণ প্রক্রিয়া থেকে আজকের উদ্বোধন অনুষ্ঠান পর্যন্ত- তারা নিশ্চয় জানে যে এই দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মধ্যে আহমদীয়া জামাতের সদস্যদের কোন কোন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে আর তাদের কতটা ছোটাছুটি করতে হয়েছে।মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের পরেও তাদের বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে।

এরপর তিনি বলেন,যেমনটি আপনারা জানেন, এই জমির মালিক জামাতকে মসজিদ নির্মাণের জন্য বিক্রয় করেছিল যার জন্য আমাদের শহর প্রশাসন মোটেই সম্মত ছিল না। জমির মালিক জমিটি শহরকে বিক্রয় করে নি কিম্বা অন্য কোন বিনিয়োগকারীরও এই

জমির প্রতি আগ্রহ ছিল না। বরং জামাত আহমদীয়াকে মসজিদ স্থাপনের জন্য বিক্রি করে দেয়, যদিও এটা বাণিজ্যিক এলাকায় অবস্থিত। আমাদের মতে মসজিদ ভবন কাউন্সিল-হল সংলগ্ন এলাকায় হওয়া বাঞ্ছনীয়। আমরা যখন জমিটি বিক্রি হয়ে যাওয়ার সংবাদ পেলাম তখন আমাদের কাছে আইনি পথে সেটাকে বাধা দেওয়ার সময় ছিল না। কিন্তু আজ আমরা এ বিষয়ে ভীষণ আনন্দিত যে অবশেষে দীর্ঘ ও কঠোর সময়ের পর এই জায়গায় মসজিদ তৈরী হল।

জামাত কর্তৃপক্ষ আমাদের শহর প্রশাসনের সঙ্গে অনেক সহযোগিতাপূর্ণ আচরণ করেছে যার পরিণামে এক দৃষ্টিনন্দন মসজিদ আমাদের সোসাইটির ঠিক মাঝখানে স্থানে পেয়েছে আর এভাবেই সমাজের মাঝে ধর্মকে স্থান দেওয়া উচিত।

আমার আন্তরিক বাসনা, এই মসজিদ মুবারক জামাতে আহমদীয়া মুসলিমার সদস্যদের জন্য কল্যাণময় উঠুক, শুধু তাই নয় সমগ্র ফ্লোরস্টাট শহর বাসী, প্রতিবেশী এবং অতিথিদের জন্যও এই মসজিদ কল্যাণময় হোক আর এই মসজিদ সকলের জন্য পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সমন্বয়ের প্রতীক হয়ে উঠুক।

সব শেষে মেয়র সাহেব বলেন, হিজ হলিনেস এবং এই মসজিদে প্রবেশকারী জামাত আহমদীয়ার প্রত্যেক সদস্যের প্রতি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি। আমাদের সকলের খোদা এক, তিনি এই মসজিদকে কল্যাণমণ্ডিত করুন।

এরপর নিডাটাল শহরের মেয়র মাইকেল হান সাহেব বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, সর্বপ্রথম আমি হুযুর আনোয়ারকে স্বাগত জানাই। এরপর সমস্ত উপস্থিতবর্গ ও জামাতের সদস্যদেরকে সালাম নিবেদন করি।

নাডাটাল শহরেও আহমদী মুসলিম জামাতের উপস্থিতি রয়েছে। এখানকার জামাতের সদস্যরা ফ্লোরোস্টাট জামাতেরই অংশ। আজ আমি আপনাদেরকে পৌরসভার পক্ষ থেকে সাধুবাদ জ্ঞাপন করতে পেরে আনন্দিত। 'মসজিদ মুবারক'- এই যে মসজিদটির নাম-এর অর্থ কল্যাণমণ্ডিত। এমন ভবনের কল্যাণ কামনাই করব। যে কথাটি আমার সব থেকে ভাল লেগেছে তা জার্মানের আমীর সাহেবের একটি উক্তি যা তিনি তাঁর পরিচিতিমূলক বক্তব্যে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, এই মসজিদে সকলেই প্রবেশ করতে পারবে একমাত্র শয়তান ছাড়া। এটি একটি ধর্মীয় সম্প্রদায় হওয়ার কারণে এই দৃষ্টিভঙ্গিটি অত্যন্ত প্রশংসনীয় যে আপনারা ধর্ম নির্বিশেষে সকলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে আগ্রহী। সব শেষে মেয়র সাহেব জামাতকে শুভেচ্ছা জানিয়ে নিজের বক্তব্যে ইতি টানেন।

এরপর প্রাদেশিক সাংসদ টোবিয়া আটার সাহেব বক্তব্য রাখেন। তিনি সর্বপ্রথম হুযুর আনোয়ার (আই.)-কে সালাম করেন এবং অভিবাদন জ্ঞাপন করেন। সেই সাথে উপস্থিত শ্রোতা ও জামাতের সদস্যদেরকেও স্বাগত জানান।

তিনি বলেন, বর্তমানে বিশ্বের অবস্থা অত্যন্ত সঙ্গীন ও ভয়াবহ। এই অন্ধকারময় সময়ে আমরা একটি আনন্দের দিন পেয়েছি। কেননা, আজ জামাতে আহমদীয়া ফ্লোরস্টিট নিজেদের মসজিদ উদ্বোধন করছে। এই মসজিদ উদ্বোধন এ বিষয়ের প্রমাণ যে জার্মানীতে সত্যিকার অর্থে ধমীয় স্বাধীনতা আছে।মসজিদ এমন এক স্থান যেখঅনে উপাসনা করা হয়। কিন্তু সেই সাথে এই স্থানে মানুষ পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়, আলাপচারিতা করে আর এটি একটি শান্তির স্থান। আমি আনন্দিত যে জামাত আহমদীয়া কেবল নিজেদের সদস্যদের বিষয়েই চিন্তিত নয়, বরং আহমদী মুসলমানেরা নিজেদের ধর্মকর্মে সমগ্র মানবতার সেবার বিষয়েও সমানভাবে মনোযোগী।

হেসে প্রদেশে আমি বিভিন্ন ভাবে জামাত আহমদীয়া মুসলেমার সঙ্গে সংস্পর্শে থেকেছি আর দেখার সুযোগ পেয়েছি যে, জামাত আহমদীয়া আমাদের সমাজের সক্রিয় অংশ। ধর্মের বিষয়ে পক্ষপাতহীন দৃষ্টিভঙ্গি অনুশীলন করা সরকারের কর্তব্য। কিন্তু হেসের প্রাদেশিক প্রশাসন নিজেদেরকে এমন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বন্ধু মনে করে যারা নিজেদের ধর্মের পাশাপাশি মানব সেবার কাজেও ভূমিকা রাখে। বিগত কয়েক বছর থেকে জামাত আহমদীয়া জার্মানী হেসে প্রদেশে স্কুলগুলিতে ধমীয় শিক্ষা তানের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে আর এক্ষেত্রে তারা অনেক সাফল্য পাচ্ছে।

আজকের এই আনন্দের দিনে আমাদের জন্য বিশ্বের ভয়াবহ সংবাদসমূহকে উপেক্ষা করা সমীচীন হবে না। পাকিস্তানে আহমদীয়া জামাতকে অনেক নির্যাতন সইতে হয়েছে। এ বছর তো নির্যাতন ও উৎপীড়নের মাত্রা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। সত্যি বলতে পাকিস্তানের অবস্থা মোটেই ভাল নয়- আহমদী কিম্বা খৃষ্টান কারো জন্যই নয়। কিছু দিন পূর্বেই গুজবের কারণে কট্টরপন্থীরা খৃষ্টান ও তাদের উপাসনাগারে চড়াও হয় এবং গির্জায় আগুন লাগিয়ে দেয়। ধমীয় আবেগের সেখানে অপব্যবহার হচ্ছে।

যেহেতু এই সব লোকেরা অন্যায়ভাবে ধর্মকে নিজেদের কাজে লাগায় যাতে দুবৃত্তি করতে পারে, তাই অনেকেরই ধর্মের সঙ্গে কোন সংস্রব নেই। বিশেষ করে এমন অন্ধকারময় সময়ে খোদার জ্যোতির প্রয়োজন বেশি করে দেখা দেয় আর শান্তি ও ভালবাসার প্রয়োজন বৃদ্ধি পায়। আহমদীয়া মুসলিম জামাতের মাঝে বিশেষ করে এই মূল্যবোধ রয়েছে। আমাদেরকে সংঘবদ্ধভাবে সমস্যার মোকাবেলা করতে হবে এবং নিজেদের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা করতে হবে। ভবিষ্যতেও আমাদেরকে জার্মানীর আইন মেনে শান্তি ও সম্প্রীতিসহকারে মিলেমিশে থাকতে হবে। আমাদের গণতন্ত্র এবং আমাদের আইন প্রত্যেককে অনেক বেশি করে স্বাধীনতা দেয়। কিন্তু সেই সঙ্গে স্বাধীনতার সদুপয়োগ করাও আমাদের দায়িত্ব। প্রত্যেক গ্রন্থ নিয়ে অবশ্যই আলোচনা করুন, বিতর্ক করুন , কিন্তু সেগুলিকে পুড়িয়ে ফেলা এবং অন্যদের ভাবাবেগে আঘাত হানা সঙ্গাত নয়।

সব শেষে তিনি বলেন, হিজ হলিনেস আরও একবার আমাদের মাঝে এসেছেন। এটা আমাদের পরম সৌভাগ্য। তাঁর আগমণে মসজিদের উদ্বোধন অনুষ্ঠানের শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে। খোদা তা'লার এই ঘর সর্বদা সম্প্রীতির প্রতীক হয়ে থাকবে, যেখানে মানুষকে সাহায্য করা হবে এবং একে অপরকে সাহায্য করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হবে। খোদার বাণী আমাদের মাঝে প্রকাশিত হোক। ধন্যবাদ।

হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ভাষণ

তাশাহুদ,তাউয ও তাসমিয়া পাঠের পর হুযুর আনোয়ার বলেন:

সম্মানীয় সকল অতিথিদেরকে আসসালামো আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বরকাতুহু

আল্লাহ্ তা'লার অশেষ অনুগ্রহ,তিনি আমাদেরকে এই এলাকায় একটি মসজিদ নির্মাণের তৌফিক দান করেছেন। আমাদের ধর্ম অনুসারে মসজিদ হল খোদার গৃহ। এটি সেই স্থানে যেখানে মানুষ একত্রিত হয়ে এক খোদার ইবাদত করে আর আল্লাহ্ তা'লা প্রদত্ত শিক্ষা অনুসারে একে অপরকে ভালবাসা ও সদাচারের শিক্ষা দেয়।

মসজিদকে রক্ষাকরা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য। মসজিদের প্রাপ্য দেওয়া একজন প্রকৃত মুসলমানদের কর্তব্য। মসজিদের প্রাপ্য দানকারী কখনও এমন কাজ করতে পারে না যার ফলে খোদা তা'লার ইবাদত এবং মানুষের অধিকার পূর্ণ হয় না। কুরআন করীমে যেখানে মুসলমানদেরকে কাফেরদের প্রতি কঠোরতা অবলম্বনের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, বলা হয়েছে যে তাদেরকে কঠোরভাবে উত্তর দাও, কিন্তু সেখানে একথা বলা হয় নি যে, মুসলমানেরা কেবল নিজেদের ধর্মকে রক্ষা করবে, বরং বলা হয়েছে যারা ধর্মের বিরুদ্ধে, যারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চায়, যারা খোদার আম্বিয়াদের শিক্ষাকে মুছে ফেলতে চায়, তাদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের একত্রিত হওয়া উচিত। এই কারণে খোদা তা'লা কুরআন মজীদে বলেছেন, সেই সব কাফেরদেরকে যদি কঠোরভাবে উত্তর দেওয়া হয় যরা মুসলমানদের ধ্বংস করে ফেলতে চায়, তবে কেবল মুসলমানেরাই ধ্বংস হবে না, বরং কোন গির্জা, সিনাগগ, মন্দির অবশিষ্ট থাকবে না। এরা ধর্মের শত্রু। তারা সেই সব ধর্মের বিরুদ্ধে যেগুলি আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে বিভিন্ন আম্বিয়াগণ নিয়ে এসেছেন।

অতএব, ইসলামের মৌলিক শিক্ষা হল ধর্মকে রক্ষা করা এবং পরধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করা। তাই আমাদের দাবি, আমরা মূসা (আ.)কেও সম্মান করি, ঈসা (আ.)কেও সম্মান করি, হিন্দুদের অবতারদেরও সম্মান করি, বৌদ্ধকেও সম্মান করি এবং প্রত্যেক সেই নবীর সম্মান করি যিনি এই পৃথিবীতে এসেছেন। বরং আমাদেরকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে তোমরা মানুষকেও সম্মান কর এবং মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন কর। কুআন করীমে এই নির্দেশও দেওয়া হয়েছে যে, যারা মূর্তি পূজা করে, শিরক করে তাদের মূর্তিকেও তোমরা নিন্দা করো না। কেননা উত্তরে তারাও তোমাদের খোদাকে গালমন্দ করবে। আর যখন তারা খোদাকে গালমন্দ করবে তখন সমাজে অশান্তি ও অরাজকতা ও ঝগড়া বিবাদের পরিবেশ তৈরী হবে।অতএব এটি ইসলামের শিক্ষা যার উপর ভিত্তি করে আমাদের এই মসজিদ নির্মিত হয়ে থাকে। এটি সেই খোদার শিক্ষা যার ইবাদত করার জন্য মসজিদ বানানো হয়ে থাকে এবং যার জন্য আমরা একত্রিত হয়ে থাকি। অতএব, প্রত্যেকের বিষয়ে এটিই আমাদের মূল ধর্মীয় শিক্ষা।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমি শুনেছি যে এই মসজিদটি নির্মাণের কারণে অনেক প্রতিবেশীর মনে আশঙ্কা তৈরী হয়েছিল। এর কারণ হল, তারা এমন সব মুসলমানদের দেখেছে যারা ইসলামের নামে অপকর্ম করছিল এবং ভ্রান্ত শিক্ষার প্রচার করছিল। ইসলামের শিক্ষা যা কুরআন করীমের শিক্ষা কিম্বা আমাদের প্রিয় নবী মহম্মদ (সা.) যে শিক্ষার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন সেই শিক্ষা হল শান্তির শিক্ষা, ভালবাসার শিক্ষা। কুরআন করীম বলেছে, প্রতিবেশিদের অধিকার দাও। এবং এত বেশি অধিকার দাও যেন তোমার গৃহ সংলগ্ন গৃহটিই তোমার প্রতিবেশি নয়, বরং চল্লিশটি গৃহ পর্যন্ত তোমাদের প্রতিবেশি। আর যারা তোমদের সফর সঙ্গী তারাও তোমাদের প্রতিবেশি। তোমাদের সহকর্মীরাও তোমাদের প্রতিবেশি। তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর। বরং আঁ হযরত (সা.) প্রতিবেশিদের অধিকার প্রদানের বিষয়ে এতটা জোর দিয়েছেন যে, সাহাবাগণ বলেন, আমরা মনে করেছিলাম হয়তো প্রতিবেশিরা আমাদের উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সম্পদ থেকেও অংশ পাবে। ইসলাম প্রতিবেশিদের এতটা অধিকার দিয়ে থাকে। তাই এমন প্রশ্নই অবান্তর যে আহমদী মুসলমানেরা নিজেদেরকে প্রকৃত ও সত্যিকার মুসলমান হওয়ার দাবি করে, তারা

রমযানের রোজা ফরজ
বৈধ অজুহাত ব্যাতিরেকে রোজা ত্যাগ করা পাপ

রমযানুল মুবারকের আগমণ ঘটেছে, মাসের নেতার আগমণ ঘটেছে, মহান মাসের আগমণ ঘটেছে। এই মহান মাসের একটি রাত্রি হাজার রাত্রি থেকে শ্রেয়। ধৈর্য ও সংযমের মাসের আগমণ ঘটেছে, যে মাসের ধৈর্যের প্রতিদান জান্নাত। এই মাসের আগমণে মোমেনদের রিযক বর্ধিত করা হয়। রহমতের মাস এসেছে, ক্ষমালাভের মাস এসেছে। আগুন থেকে মুক্তির মাস এসেছে। এই মাসের আগমণে দোযখের দরজা বন্ধ হয়ে যায় আর জান্নাতের দরজা খুলে যায়। সেই মাসের আগমণ হয়েছে যে মাসের মহান কুরআন নাযেল হয়েছে যা মানুষের জন্য হিদায়াত। সেই মাসের আগমণ হয়েছে যার পরিণামে আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গে সাক্ষাত লাভ হয়।

এই মহান মাসকে আমরা আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাই। আমরা এই মাসটির আগমণের প্রতীক্ষায় ছিলাম। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে সুস্থ সবলভাবে এই মাসে রোযা রাখার তৌফিক দান করুন এবং তা কবুল করুন। আমীন।

কল্যাণ ও পুণ্যে পরিপূর্ণ এই মাসটিতে জরুরী ছিল আল্লাহ্ তা'লা মানবজাতির জন্য রোযা রাখার বিষয়টি বিধিবদ্ধ করে দিতেন। যে বিষয়টি মানবজাতির জন্য অত্যন্ত কল্যাণকর এবং গুরুত্বপূর্ণ আল্লাহ্ তা'লাকে সেটিকে আবশ্যক করে দেন। আর যে বিষয়টি মানবজাতির জন্য ক্ষতিকর আল্লাহ্ তা'লা সেটিকে নিষিদ্ধ আখ্যায়িত করেন। অতএব, রোযার আবশ্যিক হওয়ার আমাদের বলে দিচ্ছে যে এর মধ্যে বিরাট কল্যাণ রয়েছে আর এই পবিত্র মাসের যে সকল কল্যাণের কথা উপরে বর্ণিত হয়েছে, হাদীসে যে সব বৈশিষ্টের কথা বর্ণিত আছে তাকে বোঝা যায় যে রোযা ফরজ হওয়া জরুরী ছিল। রোযা ফরয হওয়ার বিসয়ে সর্বপ্রথম কুরআন মজীদের আয়াত পেশ করা হয় যাতে আমরা জানতে পারি যে, আল্লাহ্ তা'লা রোযা ফরজ করার জন্য কোন শব্দ ব্যবহার করেছেন আর মানবজাতির জন্য রোযা রাখা আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে কতটা জরুরী। আল্লাহ্ তা'লা বলেন–

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۝

অর্থ: হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমাদের উপর রোযা বিধিবদ্ধ করা হইল, যেরূপে তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ইহা বিধিবদ্ধ করা হইয়াছিল যেন তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করিতে পার।

কাতাবা শব্দ দ্বারা আল্লাহ্ তা'লা রোযাকে ফরজ করেছেন। কাতাবা শব্দের অর্থ লেখা। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, রোযা রাখা এতটাই ফরজ ও গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, আমরা এর ফরজ হওয়ার বিষয়টি লিপিবদ্ধ করে রেখেছি যে এমনটি অবশ্যই হবে। যেমনটি অপর এক স্থানে আল্লাহ্ তা'লা বলেন– كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِيْ ؕ অর্থাৎ আমি ও আমার রসুলের বিজয় এমন এক অটল সিদ্ধান্ত যা লিখে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং যেভাবে খোদা তা'লা ও তাঁর রসুল কখনও আর কোন মূল্যেই পরাজিত হতে পারেন না আর এর জন্য 'কাতাবা' শব্দ দ্বারা এই অবধারিত বিষয়টি লিখে দেওয়া হয়েছে। তদনুরূপ মানবজাতির জন্য রোযার ফরজ হওয়া এতটাই গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী ছিল যে আল্লাহ্ তা'লা 'কাতাবা' শব্দ দ্বারা এর ফরজ হওয়ার বিষয়টি লিপিবদ্ধ করেছেন।

যখন কোন আদেশ দেওয়া হয় কুরআন করীম তখন তার কল্যাণ ও গুরুত্বের উপরও আলোকপাত করে এবং যুক্তি দিয়ে কথা বলে। এটা কুরআন মজীদের এই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। এর কোন আদেশ প্রজ্ঞাশূন্য এবং অযৌক্তিক নয়। যেমন রোযার প্রজ্ঞা ও কল্যাণের উপর আলোকপাত করে আল্লাহ্ তা'লা বলেন– 'লাআল্লাকুম তাত্তাকুন'–অর্থাৎ যাতে তোমরা সকল প্রকারের আধ্যঅত্মিক ও নৈতিক দুর্বলতা থেকে রক্ষা পাও। অতএব كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ এবং لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ দ্বারা আল্লাহ্ তা'লা রোযা রাখার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। অতঃপর বলেন– وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝

অনুবাদ: বস্তুতঃ তোমরা যদি জ্ঞান রাখ তাহা হইলে জানিও যে, তোমাদের জন্য রোযা রাখাই কল্যাণকর। (আল বাকারা:১৮)

আল্লাহ্ তা'লা বলেন, রোযা রাখা তোমাদের জন্য অবশ্যই উত্তম এবং কল্যাণকর। তোমরা যদি অনুধাবন করতে! اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ দ্বারা বলা হয়েছে যে রোযার উপকারিতা কত বিশাল আর আল্লাহ্ তা'লা চান, মানুষ যেন এর গুরুত্ব ও কল্যাণ অনুধাবন করতে পারে এবং রোযা রাখে।

এরপর তিনি বলেন– فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ؕ অর্থ: তোমাদের মধ্যে যে কেহ এই মাসকে পায়, সে যেন ইহাতে রোযা রাখে। (আল বাকারা: ১৮৬)

এখানেও আল্লাহ্ তা'লা স্পষ্টভাবে বলেছেন, যে–ব্যক্তি সুস্থ ও সবল অবস্থায় এই মাসটিকে পায় তার উচিত এই মাসে রোযা রাখা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা বলেন–

(1) كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ

(2) وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

(3) فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ؕ

বাক্য দ্বারা আল্লাহ্ তা'লা কেবলমাত্র একবার নয় বরং বারংবার রোযা রাখার প্রতি মুসলমানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আল্লাহ্ আমাদের স্রষ্টা, তিনিই সব থেকে ভাল জানেন যে আমাদের কোন জিনিসের প্রয়োজন আর কোন জিনিসের প্রয়োজন নেই। কেননা স্রষ্টা নিজের সৃস্টি সম্পর্কে যতটা অবগত অন্য কেউ তা হতে পারে না। অতএব,এটা আমাদের স্রষ্টার আদেশ যা আমাদের শারিরিক গঠন ও কার্যপ্রণালীর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়গুলি সম্পর্কে সম্যকরূপে অবগত আছেন আর তিনি চান মুসলমান রোযা রাখুক আর যাবতীয় প্রকারের আধ্যাত্মিক ও দৈহিক সমস্যাবলী থেকে রক্ষা পাক। নামায ও রোযাকে অমুসলিমরাও ঈর্ষার দৃষ্টিতে দেখে। আমরাই যদি মনে প্রাণে একথা বিশ্বাস না করি যে রোযা আমাদের জন্য উপকারী, তবে আমাদের জন্য পরিতাপ। শরিয়ত নির্দেশিত কোন বৈধ কারণ ছাড়া রোযা ত্যাগ করা অনেক বড় গুনাহ। মানুষ যদি শরিয়ত নির্দেশিত কোন কারণ ছাড়া একটিও রোযা ত্যাগ করে তবে সারা জীবনেও সেই অপূর্ণতা ঢাকা যাবে না। রসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন–

مَنْ اَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ وَلَا مَرَضٍ فَلَا يَقْضِيْهِ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهٖ وَلَوْ صَامَ الدَّهْرَ۔''

অনুবাদ: যে ব্যক্তি অকারণে রমযানের একটিও রোযা ত্যাগ করে সে যদি পরে সারা জীবনও সেই রোযার পরিবর্তের রোযা রাখে তবু সেই ঘাটতি পূর্ণ হবে না, এই ভুলের খেসারত আদায় হবে না।

আল্লাহ্র আদেশ মেনে মাত্র কয়েক ঘন্টা পানাহার থেকে বিরত থাকা বিরাট কিছু নয়। আল্লাহ্ তা'লার আদেশ অমান্য করে যে খাদ্য গ্রহণ করা হয় তা মানুষের পক্ষে উপকারী হতে পারে না। আর এমন ব্যক্তির দৈনন্দিন খাদ্যও খোদার আদেশের অন্যথা হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে বলে বিবেচিত হবে। কেননা যে ব্যক্তি এক মাস খোদা তা'লার আদেশ অমান্য করেছে, অন্যান্য সকল দিনেও সে খোদার আদেশ অমান্য করেছে বলে ধরে নেওয়া হবে। আর যে আল্লাহ্ তা'লার আদেশ মেনে রোযা রাখে তার পুরো বছরের পানাহার আল্লাহ্ তা'লার আনুগত্যের অধীন বলে বিবেচিত হবে। রমযানুল মুবারক এর রোযার গুরুত্ব ও কল্যাণের বিষয়ে একটি মহান হাদীস উপস্থাপন করা হল–

অনুবাদ: হযরত সালমান ফার্সি (রা.) বর্ণনা করেন যে রসুলুল্লাহ্ (সা.) শাবান মাসের শেষ রাত্রিতে সাহাবাদের উদ্দেশ্যে বললেন– হে মানবমণ্ডলী! এক মহান বরকত ও কল্যাণময় মাস তোমাদেরকে ছায়াবৃত করে রেখেছে। এই মাসে এমন এক রাত আছে যা হাজার রাতের চাইতে উত্তম। আল্লাহ্ তা'লা এই মাসে রোযা রাখা ফরজ হিসেবে ধার্য করেছেন আর নির্দেশ দিয়েছেন রাতের কিয়ামকে নফল ইবাদত এবং তাঁর নৈকট্য অর্জনে ব্যয় কর। যে ব্যক্তি এই দিনগুলিতে আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য অর্জনের সংকল্প নিয়ে কোন পুণ্য কর্ম সম্পাদন করে সে ফরজ কর্ম সম্পাদনের তুল্য পুণ্য লাভ করে আর যে ব্যক্তি রমযানে কোন ফরজ ইবাদত সম্পাদন করে সে সেই কাজের সত্তরগুণ প্রতিদান পাবে। এটি ধৈর্য ও সংযমের মাস আর ধৈর্যের প্রতিদান হল জান্নাত। এটি মানবতার প্রতি সহানুভুতি ও সমবেদনা প্রকাশের মাস। এই মাসে মোমেনের রিযকে বরকত দান করা হয়। যে ব্যক্তি কোন রোযাদারকে ইফতার করাবে তার সেই কাজ তার জন্য ক্ষমালাভ ও আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার কারণ হবে। আর ইফতারদানকারী ব্যক্তির প্রতিদানেও কোন ঘাটতি হবে না। সাহাবাগণ নিবেদন করেন, হে রসুলুল্লাহ্! আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই কোন রোযাদার ব্যক্তিকে ইফতার দেওয়ার সামর্থ রাখে না। আঁ হযরত (সা.) বললেন, কেউ যদি এক চুমুক দুধ, একটি খেজুর বা এক চুমুক পানি দিয়েও কাউকে ইফতার করায় সেও পুণ্যলাভের যোগ্য। আর যে ব্যক্তি কোন রোযাদারকে তৃপ্তিভরে আহার করায় আল্লাহ্ তাকে আমার হউজ থেকে শরবত পান করাবেন আর সে জান্নাতে প্রবেশ করা পর্যন্ত পিপাসার্ত হবে না। এটি এমন এক মাস যার প্রথম দশদিন রহমতের,মাঝের দশদিন ক্ষমালাভের এবং শেষ দশদিন আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার মাধ্যম। এই দিনগুলিতে যে ব্যক্তি নিজের অধীনস্ত কর্মীদের বোঝা হালকা করে এই কাজের কারণে সে ক্ষমা লাভ করে এবং জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি পায়।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এই বরকতমণ্ডিত মাসে যাবতীয় রোগব্যধি ও বিপদাপদ থেকে রক্ষা করুন এবং এর থেকে পরিপূর্ণরূপে লাভবান হওয়ার তৌফিক দান করুন। (মনসুর আহমদ মসরূর)

রমজানুল মুবারক এর উদ্দেশ্যাবলী

তাকওয়া অর্জন ও খোদার সাথে সাক্ষাত লাভ

আল্লাহ্ তা'লার অশেষ অনুগ্রহে আমাদের জীবনে আরও একবার পবিত্র রমযানের মাসের আগমণ ঘটেছে। কুরআন মজীদ ও হাদীসে রমযানের অসংখ্য আশিস ও কল্যাণের কথা বর্ণিত হয়েছে। আঁ হযরত (সা.) এক স্থানে বলেন, লোকে যদি একথা জেনে যায় যে রমযানুল মুবারকে কি কি বরকত রয়েছে, তবে তারা আকাঙ্খা করবে সারা বছরই রমযান থাকুক। কুরআন মজীদেও বর্ণিত হয়েছে যে যদি কদর এর রাত্রি কারো ভাগ্যে জোটে তবে সেই এক রাত্রি হাজার মাসের ইবাদত ও অধ্যাবসনার থেকে উত্তম। আল্লাহ্ তা'লার আমাদেরকে এই মাসটি থেকে সঠিক অর্থে কল্যাণমণ্ডিত হওয়ার তৌফিক দান করুন। আল্লাহ্ তা'লা কুরান মজীদে বর্ণনা করেছেন, তাকওয়া অর্জন করাই হল রোযার উদ্দেশ্য। যেমন তিনি বলেন-

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۝

অর্থ: হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমাদের উপর রোযা বিধিবদ্ধ করা হইল, যেরূপে তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ইহা বিধিবদ্ধ করা হইয়াছিল যেন তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করিতে পার। (আল বাকারা: ১৮৪)

কুরআন মজীদ কোন আদেশ দানের পাশাপাশি তার অন্তর্নিহিত প্রজ্ঞা ও দর্শনও বর্ণনা করে। এই বৈশিষ্ট কেবল কুরআন করীমের। যেমন কুরআন মজীদ রোযার যে প্রজ্ঞা ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছে তা হল তাকওয়া। তাকওয়া সম্পর্কে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন-

হর ইক নেকি কি জড় ইয়ে ইত্তিকা হ্যায়/ আগার ইয়ে জড় রহি সব কুছ রহা হ্যায়।

অর্থ: প্রতিটি পুণ্য কর্মের মূল হল এই তাকওয়া/ যদি এই মূল থাকে তবে সব কিছুই আছে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন-

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا وَّيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۭ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ۝

হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! যদি তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর তাহ হইলে তোমাদের জন্য এক ফুরকান (প্রভেদকারী উপকরণ) সৃষ্টি করিয়া দিবেন এবং তোমাদের অকল্যাণসমূহকে দূর করিয়া দিবেন এবং তোমাদিগকে ক্ষমা করিবেন, বস্তুত আল্লাহ্ তা'লা মহা অনুগ্রহের অধিকারী। (আনফাল: ৩০)

এরপর তিনি বলেন- اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّالَّذِيْنَ هُمْ مُّحْسِنُوْنَ ۝

অর্থ: নিশ্চয় আল্লাহ্ সঙ্গে আছেন তাহাদের যাহারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং তাহাদেরও যাহারা সৎকর্মশীল। (আল নহল: ১২৯)

কাজেই যেহেতু যাবতীয় পুণ্যের মূলে রয়েছে তাকওয়া আর রোযার উদ্দেশ্যও তাকওয়া অর্জন করা, তাই আল্লাহ্ তা'লা বারবার বিভিন্নভাবে রোযা রাখার উপদেশ দান করেছেন। সর্বপ্রথম আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ অর্থাৎ রমযানের রোযা তোমাদের জন্য ফরজ করা হয়েছে। তাই কোন রোযা রাখা বা না রাখার বিকল্প নেই। যেভাবে নামায ফরজ করা হয়েছে অনুরূপভাবে রোযাও ফরজ। কেউ যদি বৈধ কারণ ছাড়া রোযা না রাখে তবে পাপী হবে। আল্লাহ্ তা'লা আরও বলেন- وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝ তোমরা যদি এই বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারতে যে রোযা রাখা তোমাদের জন্য অবশ্যই উত্তম এবং কল্যাণের কারণ। اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ বাক্যে বলা হয়েছে যে রোযার কল্যাণ অগণিত। আল্লাহ্ তা'লা চান মানুষ এর গুরুত্ব ও কল্যাণ উপলব্ধি করে রোযা রাখুক। এরপর বলা হয়েছে- فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۭ এখানেও আল্লাহ্ তা'লা স্পষ্টভাবে বলেছেন, যে ব্যক্তি সুস্থ ও সবল অবস্থায় রযমান মাস পায় তার উচিত রোযা রাখা। সুতরাং রোযার অসাধারণ উপকারিতা দৃষ্টিপটে রেখে মহান আল্লাহ্ তা'লা বিভিন্নভাবে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন যে রোযার উপকারিতা অসাধারণ আর রোযা রাখা আমাদের জন্য শ্রেয়।

বস্তুত রোযা তাকওয়া অর্জন এবং খোদা তা'লার সঙ্গে সাক্ষাতের মাধ্যম। কেননা,রোযা এমন এক ইবাদত যার মধ্যে সমস্ত ইবাদত সমন্বিত হয়েছে। যদি কোন ব্যক্তি কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত রোযা সংক্রান্ত এই সব নির্দেশাবলী এবং বিধিনিষেধ দৃষ্টিপটে রাখে তবে সে অবশ্যই তাকওয়া অর্জনকারী হবে এবং তাকওয়ার পথে উন্নতি করবে যার পরিণামে সে আল্লাহ্ তা'লার সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ করবে।

১) একজন রোযাদার বা-জামাত নামায নিজের উপর অনিবার্য করে নেয়। কেননা, সে জানে যে এটি ছাড়া রোযার উৎকৃষ্ট পরিণাম পাওয়া সম্ভব নয়।

২) একজন রোযাদার বা-জামাত নামায পড়ে, শুধু তাই নয়, বরং রমযানুল মুবারকে তাহাজ্জুদের নামাযও পড়ে।

৩) এছাড়া কুরআন করীমের তিলাওয়াতও করে। এবং একবার কুরআন অবশ্যই শেষ করে।

৪) এছাড়া তারাবিহর নামায পড়ারও তৌফিক লাভ করে। এতেও পুরো কুরআন করীম শোনার সুযোগ হয়।

৫) সারা রমযানে রোযাদার বিশেষভাবে দোয়ার তৌফিক লাভ করে। কেননা, রমযানুল মুবারকের সঙ্গে দোয়ার নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে।

৬) এই পবিত্র মাসে এতেকাফও করা হয় যার মাধ্যমে ফরজের পাশাপাশি নফল, কুরআন করীমের তিলাওয়াত এবং দোয়ার তৌফিক লাভ হয়। এছাড়া লায়লাতুল কদরের সন্ধানে নামাযের মধ্য দিয়ে রাত্রিযাপন করা ও এতেকাফ করা ইবাদতের সৌন্দর্যের ভিন্ন মাত্রা যোগ করে।

৭) একজন রোযাদার এই পবিত্র মাসে দান-খয়রাত এবং দরিদ্র সেবার প্রতি বিশেষভাবে যত্নবান থাকে।

৮) একজন রোযাদার একদিকে যেমন এই সমস্ত ইবাদত সম্পাদন করে, তেমনি সেই সব বিষয় থেকেও বিরত থাকে যেগুলি থেকে আঁ হযরত (সা.) বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন, আঁ হযরত (সা.) বলেছেন,

مَنْ لَّمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ فِيْ اَنْ يَّدَعَ طَعَامَهٗ وَشَرَابَهٗ۔

যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা এবং মিথ্যা কর্ম থেকে বিরত হয় না এমন ব্যক্তির পানাহার ত্যাগ করা আল্লাহ্‌র তা'লার কোন প্রয়োজনে আসে না।

(বুখারী, কিতাবুস সওম)

সুতরাং, একজন রোযাদার এই পবিত্র মাসে মিথ্যা, ঝগড়া বিবাদ, ছলচাতুরি -বস্তুত যাবতীয় অসৎকর্ম থেকে বিরত থাকার চেষ্টাকরে। অতএব, রোযা এমন এক ইবাদত যার মধ্যে সকল ইবাদতের সমাবেশ ঘটেছে এবং এতে যাবতীয় অসৎকর্ম থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই কারণেই আল্লাহ্ তা'লা কুরআন মজীদে তাকওয়া অর্জনকে রোযার উদ্দেশ্য হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।

বস্তুত, রোযার পরিণামে রোযার পরিণামে কাশফ এবং ইলহামের দ্বারও উন্মুক্ত হয় আর সব থেকে বড় পুরস্কার হল আল্লাহ্‌র সাক্ষাত লাভ। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَأَكْلَهُ وَشُرْبَهُ مِنْ أَجْلِي، وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ، وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ الصَّائِمِ فَرْحَةٌ حِينَ يُفْطِرُ وَفَرْحَةٌ حِينَ يَلْقَى رَبَّهُ، وَلَخُلُوفُ فَمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ"

(বুখারী, হাদীস-৭৪৯২)

হযরত আবু হুরাইরাহ (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম (সা.) বলেছেন,'মহাসম্মানিত আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, 'রোযা কেবল আমার জন্য আর আমি স্বয়ং এর প্রতিদান। মানুষ আমার সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে নিজের কামনা-বাসনা, পানাহার ত্যাগ করে। রোযা পাপ থেকে রক্ষার বর্মস্বরূপ। রোযাদারের জন্য দুটি আনন্দ। একটি আনন্দ সে সেই সময় লাভ করে যখন সে ইফতার করে এবং অপর আনন্দটি সে লাভ করবে যখন নিজ প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাত করবে। রোযাদারের মুখের ঘ্রাণ আল্লাহ্ তা'লার নিকট কস্তুরির সুগন্ধি থেকেও বেশি পবিত্র।"

রোযার পরিণামে ইহজগতেই আল্লাহ্ তা'লার সাক্ষাতলাভ হয়। মৃত্যুর পর আল্লাহ্ তা'লার সাক্ষাত লাভ হবে এমন ধারণা করা উচিত নয়। কেননা مَنْ كَانَ فِيْ هٰذِهٖٓ اَعْمٰى فَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ اَعْمٰى আয়াত অনুসারে যে ব্যক্তি ইহজগতে আল্লাহ্ তা'লার সাক্ষাত লাভে বঞ্চিত থাকে সে পরকালেও বঞ্চিত থাকবে। আর যে ব্যক্তি পরকালে বঞ্চিত থাকবে না সে ইহকালে আল্লাহ্ তা'লার সাক্ষাত লাভ করবে। রোযার পরিণামে আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভ ও তাঁর সাক্ষাত লাভের বিষয়ে সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (আ.) বলেন-

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ আয়াতে রোযার আরও একটি কল্যাণের কথা বলা হয়েছে। এর পরিণামে তাকওয়ার ক্ষেত্রে অবিচলতা লাভ হয় এবং মানুষ আধ্যাত্মিকতার উচ্চমার্গে উপনীত হয়। যেমন রোযার পরিণামে কেবল ধনীরাই আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভ করে না, বরং অভাবপীড়িতরাও নিজেদের মধ্যে এক নতুন আধ্যাত্মিক পরিবর্তন অনুভব করে, তারাও আল্লাহ্ তা'লার সাক্ষাত লাভে ধন্য হয়। অসহায় গরিবরা সারা বছর অভাব অনটনের মধ্যে দিনানিপাত

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023 -2025 Vol-9 Thursday, 4 April, 2024 Issue No.14

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

করে, অনেক সময় তাদেরকে অনাহারেও থাকতে হয়। আল্লাহ্ তা'লা রমযানের মাধ্যমে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, তাদের অনাহারে থেকে পুণ্য অর্জন সম্ভব। আর খোদা তা'লার নিকট অনাহারে থাকার এমন বিরাট পুণ্য রয়েছে যে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–আল্লাহ্ তা'লা বলেন– اَلصَّوْمُ لِيْ وَاَنَا اَجْزِيْ بِهٖ অর্থাৎ সমস্ত পুণ্যের প্রতিদান ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু রোযার প্রতিদান স্বয়ং আমি। খোদা লাভের পর মানুষের আর কি চাওয়া থাকতে পারে? বস্তুত রোযার মাধ্যমে গরিবদের বোঝানো হয়েছে যে অভাব অনটনের মাঝেও যদি সে ধৈর্য ধারণ করে এবং অকৃতজ্ঞ না হয়, মুখ বুজে সব সহ্য করে নেয়, তবে এই অনাহার যাপন ও অভাবন অনটনই তাদের জন্য পুণ্য বয়ে আনবে, খোদা তা'লা স্বয়ং তাদের প্রতিদান হবেন। আল্লাহ্ তা'লা রোযার মাধ্যমে তাদেরকে এমন উপায় বলে দিয়েছেন যে যদি এই অনাহার ও অভাব অনটনের জীবনকে খোদা তা'লার সন্তুষ্টির পথে পরিচালিত করা হয় তবে এই এটাই তাদেরকে আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গে মিলিত করতে পারে। (তফসীরে কবীর, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৭৭)

রোযার একটি আধ্যাত্মিক কল্যাণ হল মানুষ খোদা তা'লার সঙ্গে সাক্ষাতের উচ্চ মার্গে পৌঁছে যায় আর খোদা তা'লা স্বয়ং তার রক্ষক হয়ে ওঠেন।

সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ আয়াত থেকে রমযান মসের মহত্ব অনুধাবন করা যায়। সুফিগণ লিখেছেন, এই মাসটি হৃদয়কে আলোকিত করার জন্য উৎকৃষ্ট মাস। এই মাসে বিপুল হারে দিব্যদর্শন লাভ হয়। নামায মানুষের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে আর রোযা হৃদয়কে আলোকিত করে। অন্তরকে পরিশুদ্ধ করার অর্থ নফসে আম্মারা বা অবাধ্য আত্মার কামনা–বাসনা থেকে দূরত্ব তৈরী হওয়া এবং হৃদয়ে আলোকিত করার অর্থ কাশফ বা দিব্যদর্শনের দ্বার উন্মুক্ত হওয়া অর্থাৎ খোদার সাক্ষাত দর্শন হওয়া।

(মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃ: ৫৬১)

উপরোক্ত হাদীস ও উদ্ধৃতি থেকে জানা যায় যে, রোযার পরিণামে আল্লাহ্ তা'লার সাক্ষাত লাভ হয় আর কাশফ ও ইলহামের দ্বার উন্মুক্ত হয়। আল্লাহ্ তা'লা এই মাসটি থেকে আমাদেরকে যথাযথভাবে কল্যাণমণ্ডিত হওয়ার তৌফিক লাভ করুন। আমীন। (মনসুর আহমদ মসরূর)

****

৯পাতার পর.

কখনও কোন প্রতিবেশিকে কোনওভাবে কষ্ট দিবে।তাই এই দিক থেকে আমি পুনরায় একথা স্পষ্ট করে দিতে চাই যে, আমাদের প্রতিবেশিদের এ বিষয়টি নিয়ে নিশ্চিন্ত থাকা উচিত।

হুযুর আনোয়ার বলেন: মসজিদ প্রথমত খোদা তা'লার ইবাদতের জন্য তৈরী হয়েছে। এলাকায় শান্তি ও ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্বের প্রতীক হিসেবে এই মসজিদটি গড়ে উঠেছে। এই মসজিদ নির্মিত হয়েছে ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্বের জয়ধ্বনি উচ্চকিত করার উদ্দেশ্যে আর যেন আমরা এই দৃষ্টিকোণ থেকে প্রতিবেশিদের প্রতি যত্নবান থাকি এবং তাদের দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে পারি।

হুযুর আনোয়ার বলেন: মেয়র সাহেবকেও আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই। তিনিও নিজের বন্ধুত্বের মর্যাদা রেখেছেন। যে মসজিদটি আমি এখন উদ্বোধন করতে গিয়েছিলাম, সেখানে তিনি এসেছিলেন, আমার সঙ্গে তিনি সাক্ষাত করেন। গতবার আমি যখন এখানে এসেছিলাম, সেবারও তিনি আমার সঙ্গে সাক্ষাত করেছিলেন। সব কথা তার মনেও ছিল। তিনিও অনেক ভক্তি ও ভালবাসা দেখিয়েছিলেন। এই জন্য আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানাতে চাই যে, তিনি জামাত আহমদীয়াকে অনেক সমাদরের দৃষ্টিতে দেখেন এবং আমাদের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করছেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: যদিও মসজিদ এমন এক স্থানে নির্মিত হয়েছে যেটা আদতে টাউন সেন্টার, যেখানে ব্যবসায়িক কেন্দ্রই বেশি। বাজারহাট ও কেনাবেচার পণ্য বেশি দেখা যায়। কিন্তু এমন স্থানে ধর্মেরও প্রতিনিধিত্ব থাকা উচিত যাতে প্রকৃত আধ্যাত্মিক শিক্ষা সম্পর্কেও মানুষ জানতে পারে। মানুষ যেন সেই সব বিষয় সম্পর্কে জানতে পারে যা খোদা তা'লা তাঁর বান্দাদের দান করছেন যাতে মানুষ যখন কোন পার্থিব বিষয়কে দেখে এবং তার থেকে উপকৃত হয় তখন সে যেন নিজের সৃষ্টিকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞ হয় এবং এই দিক থেকে সব সময় তাঁকে স্মরণ রাখে, নিজেদের সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ রাখে এবং তাঁর ইবাদতের হক আদায় করে।আমি আশা করি, ইনশাআল্লাহ্ এই মসজিদটি তৈরী হওয়ার পর আহমদীরা, যাদের সম্পর্কে অধিকাংশ মানুষ উল্লেখ করেছেন যে, তাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রয়েছে এবং তারা খুব ভাল আহমদী–তারা আরও বেশি করে নিজেদের নৈতিক ও চারিত্রিক গুণাবলীর বহিঃপ্রকাশ ঘটাবেন এবং এই মসজিদ শান্তি ও ভালবাসার প্রতীক হিসেবে এলাকায় পরিচিতি লাভ করবে।

নিডাটাল শহরের মেয়র সাহেব এসেছেন। তাঁকেও ধন্যবাদ জানাই। তিনি অনেক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেছেন। পার্লামেন্ট সদস্যও এসেছেন, তাঁকেও ধন্যবাদ জানাই। তিনিও শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেছেন, সত্যিকার অর্থেই আমাদের পৃথিবীতে শান্তি ও নিরাপত্তার প্রয়োজন। পৃথিবীর ধ্বংসের দিকে ধাবিত হচ্ছে। কারণ আমরা নিজেদের স্রষ্টাকে ভুলে বসেছি। পার্থিবতায় আমরা অনেক বেশি ডুবে রয়েছি। আমরা নিজেদের স্বার্থকে বেশি করে বুঝতে শুরু করেছি। অন্যের অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে আমাদের মনোযোগ নেই। এরই অনিবার্য পরিণাম স্বরূপ যা হওয়ার ছিল তাই হচ্ছে, একে অপরের বিরুদ্ধে অন্যায় হচ্ছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আল্লাহ্ তা'লা কুরআন মজীদে আমাদেরকে এই শিক্ষা দিয়েছেন যে যদি তোমরা বান্দার অধিকার প্রদান না কর তবে তোমাদের ইবাদত তোমাদের দিকেই নিক্ষেপ করা হবে, ফিরিয়ে দেওয়া হবে। যদি তোমরা অভাবীদের প্রতি যত্নবান না হও তবে তোমাদের নামায ও ইবাদত গৃহীত হবে না। যদি তোমরা অনাথদের প্রতি যত্নবান না হওয়া তোমাদের নামায ও ইবাদত গৃহীত হয় না। যদি তোমরা মিসকীনদের প্রতি যত্নবান না হও তবে তোমাদের নামায ও দোয়াসমূহ গৃহীত হয় না। মসজিদ আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে যদি তোমরা এক খোদার ইবাদত করতে আস তবে বান্দার অধিকারও প্রদান করে এস। অনাথদের প্রতিও যত্নবান হও, মিসকীনদের খেয়াল রাখ, অভাবীদেরও খেয়াল রাখ, এরপর আমার কাছে এস, আমার মসজিদে এস, আমার ইবাদত কর, তবেই তোমাদের দোয়াও আমি গ্রহণ করব। অতএব মসজিদ আমাদেরকে হুকুকুল্লাহ্ ও হুকুকুল ইবাদ পালনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সাংসদ মহাশয় একথার উল্লেখ করেছেন যে পৃথিবীতে অন্যায় সংঘটিত হচ্ছে, গির্জাও ভূপাতিত করা হচ্ছে, মসজিদেরও ক্ষতি করা হচ্ছে। যেখানে একটি ফির্কার সঙ্গে অপর ফির্কার মতপার্থক্য তৈরী হয় বা একটি ধর্মের সঙ্গে অন্য ধর্মের মত মনমালিন্য দেখা দেয়, সেখানে এগুলো হচ্ছে। আর দুর্ভাগ্যবশঃ মুসলমান দেশগুলোতে এমন অন্যায় ও নির্যাতনের ঘটনা বেশি করে প্রকাশ্যে আসছে। কিম্বা বলতে পারেন, বর্তমানে ইউরোপেও প্রকাশ পাচ্ছে। যেমন তিনি যুদ্ধের উদাহরণও দিয়েছেন। আঁ হযরত (সা.) এই শিক্ষা দান করেছেন যে, সেই সব অত্যাচারের বিরুদ্ধে সরব হও আর অত্যাচারিতকেও সাহায্য কর এবং অত্যাচারীকেও সাহায্য কর। সাহাবাগণ একথা শুনে জানতে চাইলেন যে অত্যাচারিতদের আমরা অত্যাচারীর হাত থেকে উদ্ধারে মাধ্যমে সাহায্য করতে পারি, কিন্তু অত্যাচারীকে কিভাবে সাহায্য করব? আঁ হযরত (সা.) বললেন, অত্যাচারীকে সাহায্য করার অর্থ হল তার অত্যাচারী হাতকে প্রতিহত করা। কেননা, সে যদি অন্যায় ও অত্যাচারের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে তবে আল্লাহ্ তা'লার অপ্রীতিভাজন হবে এবং তাঁর শাস্তির প্রকোপে পড়বে। আর এইরূপে সে নিজের ইহকাল ও পরকালকে ধ্বংস করে ফেলবে। তাই যারা ধার্মিক তারা ইহজগতের প্রতি দৃষ্টি রাখে না। বরং পরকালের প্রতিই তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে। তারা কেবল নিজের চিন্তায় মগ্ন থাকে না, বরং তাদের এই চিন্তাও থাকে যে, অপরকে কিভাবে পরকালের শাস্তি থেকে রক্ষা করা যায় এবং আল্লাহ্ তা'লার অপ্রীতিভাজ হওয়া থেকে রক্ষা করা যায়। এটিই সেই উদ্দেশ্য যার জন্য আমরা সঠিক অর্থে ইবাদত করার চেষ্টা করে থাকি আর আমরা যখন সঠিক অর্থে আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত করব, তখন আমাদের মধ্যে মানুষের প্রাপ্য অধিকার প্রদানের স্পৃহা তৈরী হবে। অত্যাচারী ও অত্যাচারিত উভয়কে সাহায্য করার মনোবলও তৈরী হবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন= 'আল্লাহ করুন এখন এই মসজিদ তৈরী হওয়ার পর এখানে বসবাসকারী জামাত আহমদীয়ার সদস্যরা পূর্বের থেকে বেশি নিজেদের অস্তিত্বের পরিচয় জানান দিতে সক্ষম হবে। আর সেই পরিচয় হল শান্তি, ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্বের। তারা সেই শিক্ষার প্রসারকারী হবে যা ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্বের শিক্ষা হবে আর এইরূপে আমরা পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনকারী হব এবং অন্যায় অত্যাচারের অবসানকারী হব, এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে সরব থাকব। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলকে এর তৌফিক দান করুন। আমীন।

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir